মাওলানা খন্দকার মুশ্‌তাক আহ্‌মদ

নবী (সা.) জীবনের টুকরো কথা

মাওলানা খন্দকার
মুশ্‌তাক আহ্‌মদ শরীয়তপুরী
শিক্ষক, জামি'আ ইসলামিয়া আরাবিয়া
৩/৪ কোতোয়ালী রোড, তাঁতীবাজার, ইসলামপুর
ঢাকা-১১০০।

প্রকাশনায়
gvKZvevZzj Aveivi
ইসলামী টাওয়ার
১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাঃ 01712-306364

নবী (সা.) জীবনের টুকরো কথা
মাওলানা খন্দকার
মুশ্‌তাক আহ্‌মদ শরীয়তপুরী

প্রকাশনা ঃ
মাকতাবাতুল আবরার
১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০

প্রথম প্রকাশ ঃ
নভেম্বর ১৯৯৭ ঈসায়ী

তৃতীয় প্রকাশ
জানুয়ারী ২০১২ ঈসায়ী

মূল্য ঃ
৮০/= (আশি টাকা মাত্র)

Nabi jiboner tukro katha
Written by : Maolana khandakar Mushtak Ahmad shariatpury
Published by : Maktabatul Abrar
Islami Tower, 11/1 Banglabazar, Dhaka-1100

পূর্ব কথা

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده ونصلى على رسوله الكريم - اما بعد

বালাগাল উলা বিকামালিহী, কাশাফাত দুজা বিজামালিহী,
হাসুনাত জামিউ খিসালিহী, সাল্লু আলাইহি ওয়া আলিহী

কিঞ্চিত কালিমা'র কথা কোনদিন কল্পনাও করা যায় না যার জীবনে। সকল উন্নত ও উচ্চ গুণাবলীর যিনি সর্বোচ্চ আধার। চোখ বুজে যার অনুরসরণ করা যায়, শুধু তাই নয় যার অনুসরণের মধ্যেই রয়েছে একমাত্র শান্তি ও মুক্তির নিশ্চয়তা। যার নীতি-দর্শন বিশ্ব মানবের জন্য মহা মুক্তির রাজপথ। যে কোন শ্রেণীর মানুষ জীবনের যে কোন অবস্থা ও পরিস্থিতিতে যাঁকে রাহবর হিসেবে পেতে পারে। সামগ্রিক মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে সার্বজনীন নীতি-আদর্শের যিনি একমাত্র উৎস। যাঁর গোলাম হতে পারলে তা নিয়ে গর্ব করা যায়, যার সৌন্দর্যের সীমা-পরিসীমা নির্ধারণ করতে পারেনি কেউ কোনদিন। সকল লেখক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, দার্শনিক ব্যর্থ হয়েছেন যাঁর গুণাবলীর যথার্থ বিবরণ দিতে, বাধ্য হয়েছেন বলতে একথা,

"লা ইউমকিনুস্ সানা-উ কামা কা-না হাক্কুহূ,

বা'দাজ খোদা বুযুর্গ তু হী কিস্সা মুখতাসার"

তোমার গুণ-গরীমার যথার্থ বিবরণ আমাদের সম্ভব শক্তির বাইরে, তবে সংক্ষেপে এতটুকু বলতে পারি যে, "আল্লাহ পাকের পরেই তুমি মহান"। তিনি হলেন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী, রহমতে আলম, সরদারে দো-জাঁহা হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

হতাশা! নৈরাজ্য!! চারিদিক অন্ধকার!!! নীতি নৈতিকতা বিবর্জিত সমাজ ও রাষ্ট্র। গোত্রে গোত্রে মারামারি, কাটাকাটি, হত্যা, সন্ত্রাস, মদ, জুয়া, চুরি, ডাকাতি, জুলুম, নির্যাতন, নিপীড়ন, নিস্পেশন, দমন, পীড়ন, ধর্ষণ, হাইজ্যাক, লুণ্ঠন চলছে অবিরত। বংশীয় আধিপত্য, নিকৃষ্ট সাম্প্রদায়ীকতা, অংশীবাদ, পৌত্তলিকতা ও চারিত্রিক অবক্ষয়ে বিশ্ব আবহাওয়া যখন বিষবাষ্পে পরিণত। যৌন ক্ষুধা চরিতার্থ করতে মা বোনের পার্থক্য যখন নির্বাসিত প্রায়। যুবক যুবতী নির্বিশেষে যত্র-তত্র কুপ্রবৃত্তির স্পৃহা চরিতার্থ করতে তারা যখন ব্যাপক ভাবে মত্ত। এমনি হাজারো অশ্লীল ও নোংরা কর্ম-কাণ্ডের অন্ধকারে পাপের সকল বিভীষিকাসহ গোটা সমাজ ও রাষ্ট্র যখন মূর্খতায় আচ্ছাদিত। তখন এ জগতে আগমন করলেন বিশ্ব শান্তি ও মুক্তির অগ্রদূত, চিরন্তন কল্যাণের মহান দিশারী, সর্বকালে সর্বশ্রেণীর মানুষের আদর্শ প্রশিক্ষক, সকল গুণের সর্বোচ্চ আধার, আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

বিপর্যস্ত সামজ ও রাষ্ট্রে যখন একজন আদর্শবান ও নীতি নৈতিকতায় সমৃদ্ধ মহান প্রশিক্ষকের প্রয়োজন ছিলো,

ঠিক তখনই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সার্বিক গুণাবলী ও অধঃপতিত মানবতার মুক্তিব্রত নিয়ে ধরায় আগমণ করেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপন জীবনে সকল প্রকার আদর্শিক গুণাবলীর বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে বিশ্ব বাসীর সামনে একটি বাস্তব ও কার্যকর শিক্ষা তুলে ধরেছিলেন। আর মূলতঃ এটিই ছিলো প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর গোটা বিশ্বকে আদর্শিক ভাবে জয় করার মূল দর্শন।

বর্তমান গ্রন্থ " নবী (সা.) জীবনের টুকরো কথা" তে আমরা সে মহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মহান গুণাবলী থেকে অর্ধ শতাধিক উন্নত গুনাবলীকে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবনের বাঁকে বাঁকে সংঘটিত টুকরো কাহিনীমালার আলোকে বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেছি।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুমহান ব্যক্তিত্ব ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবন নিয়ে বিভিন্ন ভাষায় রচিত ক্ষুদ্র-বৃহৎ অসংখ্য গ্রন্থাবলীর তুলনায় আমার এ আলোচনা নিতান্তই নগণ্য, যে নগণ্যতা বুঝানোর কোন শব্দ আমার জানা নেই। তা সত্ত্বেও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাহাত্ম্য, বড়ত্ব ও বিশালত্ব সম্পর্কে দু'এক কলম লিখে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবন বিশ্লেষকদের সুবিশাল তালিকায় অধমের নামটা লিপিবদ্ধ করিয়ে নেয়ার মহান আকংখা বুকে নিয়েই এ ক্ষুদ্র নাযরানা "নবী (সা.) জীবনের টুকরো কথা"।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে কিছু বলতে বা লিখতে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। যতটা আমাদের মত "কিছুই না" পর্যায়ের লোকদের দ্বারা সম্ভব না হওয়ারই কথা। তা সত্ত্বেও

বর্তমান গ্রন্থ রচনায় আমরা সম্ভব্য সব রকম সতর্কতা অবলম্বন করতে চেষ্টা করেছি। তবুও ভুল ভ্রান্তি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। তাই সে ব্যাপারে প্রথমেই মহান আল্লাহ পাকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর তা সংশোধনের ব্যাপারে আমরা সম্মানিত পাঠক বর্গের সহযোগিতা কামনা করছি।

পরিশেষে আমি আমার এ ক্ষুদ্র মিহনতের সবটুকুই মুমিন হৃদয়ের মধ্যমণি, পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় নিষ্কলঙ্ক, সাগরের ন্যায় উদার, আকাশের মত বিশাল সত্তার অধিকারী, মদীনার পরশ-মানিক প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র চরণে নাযরানা পেশ করলাম। আর এর আজরও সওয়াব কিছু থাকলে তা আমার মুহ্তারাম পিতা-মাতা ও সারে তাজ আসাতিজাগণের সমীপে নিবেদন করলাম। ইয়া আল্লাহ! আপনি কবুল করুন।

বিনয়াবনত

মুশ্তাক আহ্মদ
শিক্ষক, জামি'আ ইসলামিয়া আরাবিয়া
৩/৪ কোতোয়ালী রোড, ইসলামপুর
ঢাকা-১১০০।

কি **কোথায়**

সমবেদনা

বৃদ্ধ একটি গোলাম। ভারী কাজতো দূরের কথা হালকা কাজ করাও তার পক্ষে এখন অসম্ভব প্রায়। কিন্তু সে যে গোলাম, তাকে অন্যের হাতে বিক্রিত হতেই হবে। কাজ করে যেতেই হবে সদা সর্বদা। এ স্বাভাবিক নিয়ম মতে বৃদ্ধ সে গোলাম বিক্রিত হলো এক ধনাঢ্য ব্যক্তির কাছে, ধনাঢ্য সে লোকটি গোলামকে নিয়ে তার একটি বাগানে পানি দেয়ার কাজে নিয়োগ করলো।

বাগানটি ছিলো বেশ বড়। পানিও ছিলো অনেক দূরে। সেই দূর থেকে পানি এনে বাগানে দিতে ঐ বৃদ্ধ গোলামের সীমাহীন কষ্ট করতে হত। তা সত্ত্বেও সে গোলাম তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে অলসতা করতো না। একদিনের কথা–

বৃদ্ধ গোলাম বাগানে পানি দিচ্ছে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে পথ ধরে কোথাও যাচ্ছিলেন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নযরে পড়লো বৃদ্ধ গোলাম। দয়ার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মায়াভরা মন নিয়ে এগিয়ে গেলেন লোকটির কাছে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখলেন, অনেক কষ্টে সে পানির পাত্র বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পানি বহন করে নিয়ে যাওয়ার কষ্টে তার পা দু'টো কাঁপছে। যেন এখনি মাটিতে পড়ে যাবে লোকটি।

এ দৃশ্য অবলোকন করে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মন ব্যথিত হয়ে উঠলো। তিনি লোকটির কাছে গিয়ে তাকে একটি গাছের ছায়ায় আরামে বসিয়ে দিলেন। এবং নিজেই পানি বহন করে এনে বাগানে পানি দিতে লাগলেন। এক পর্যায়ে পুরো বাগানে পানি দেয়া শেষ হলো।

এবার হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুনরায় লোকটির কাছে এসে অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ ভাষায় তাকে বললেন, ভাই আজকের মত তোমার আর কাজ করতে হবে না। আমি পুরো বাগানে পানি দেয়া শেষ করেছি। তবে আজকের পর আবার যখন তোমার উপর কোন কঠিন কাজের দায়িত্ব ন্যাস্ত হবে, তখন সে কথা তুমি আমাকে জানাবে, আমি এসে তোমার কাজ করে দিব।

আজো আমাদের সামনে এ জাতীয় অসংখ্য দৃশ্যের অবতারণা ঘটে। আমরাও যদি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপরোক্ত টুকরো ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে মানুষের দুঃখ কষ্টে তাদের পাশে দাঁড়াতে শিখি, তবে আমাদের সমাজে আজো শান্তি, সমবেদনা সহমর্মিতা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

সহমর্মিতা

জীর্ণ-শীর্ণকায় একটি গোলাম। স্বাভাবিক দর্শনেই রোগাক্রান্ত মনে হয়। বর্তমান অবস্থায় আরো অসুস্থ। মালিকের নির্দেশ তাকে আটা চূর্ণ করতে হবে, তাও আবার অনেক গম যা চূর্ণ করে আটা তৈরী করতে হবে এটা তার কাজ, তার দায়িত্ব। অপরাগ হয়ে সে আটা চূর্ণ করতে বসেছে। অনেক কষ্টে আটা চূর্ণ করছে আর শারীরিক কষ্টে কোঁকাচ্ছে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রহমতের নযর পড়লো লোকটির উপর। সহসা কেঁপে উঠলো হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দয়ার দিল। তিনি এগিয়ে গেলেন গোলামের কাছে "কি হয়েছে ভাই তোমার তুমি কিসের কষ্টে কোঁকাচ্ছো ? আমাকে বলো, আমি যদি তোমার কোন উপকার করতে পারি" অত্যন্ত দয়া ও মায়া ভরা কণ্ঠে কথাগুলো বললেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথায় লোকটি খানিকটা আশ্বস্ত হলো। খুব শান্ত কণ্ঠে সে বললো, আমি আজ ক'দিন অসুস্থ। সুস্থতার জন্য আমি আমার মুনিবের কাছে কয়েক দিনের জন্য ছুটি চেয়েছিলাম, কিন্তু অনেক কাকুতি-মিনতি করার পরেও মুনিব আমাকে ছুটি দিতে রাযী হয়নি বরং আমাকে নিয়মিত কাজ করতে বাধ্য করছে। আজ আমাকে আটা চূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছে। আমি যদি তা না করি তবে বিপদ হবে, তাই এ অসুস্থ শরীরেই আমি আটা গুড়ো করার কাজ করতে বাধ্য হচ্ছি।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবার ঐ গোলামকে বললেন, ভাই তুমি একটু শুয়ে আরাম কর, তোমার কাজটা আমি করে দিচ্ছি। এই বলে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আটা চূর্ণ করতে বসে গেলেন। ধীরে ধীরে বেশ সময়ে তিনি সবগুলো গম চূর্ণ করে আটা তৈরী করলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবার গোলামকে আটা চূর্ণ সম্পন্ন হওয়ার সংবাদ দিয়ে বিদায় নিলেন। যাওয়ার পূর্বে তিনি ঐ গোলামকে বলে গেলেন, ভাই! আবার যখন তোমার কোন কাজে সহযোগিতার প্রয়োজন হবে সাথে সাথে আমাকে তুমি সংবাদ দিবে, আমি এসে তোমার কাজ করে দিয়ে যাবো।

আজ আমাদের সমাজে এ জাতীয় নির্যাতিত চাকর-বাকর আর দাস-দাসীর সংখ্যা কি কম ? আমরা কি পেরেছি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদর্শের দীক্ষা নিয়ে তাদের দুঃখ কষ্টে তাদের পাশে দাড়াতে ?

নির্লোভতা

বিপুল পরিমাণ রাজস্ব। মসজিদে নববীর চত্বরে রকমারী মালপত্রের বিশাল স্তুপ। বাহরাইন থেকে আসা মুসলিম সম্পদ এগলো। যার মধ্যে বিভিন্ন ধরণের মূল্যবান আসবাবপত্র ছাড়াও ছিলো উল্লেখযোগ্য পরিমাণ স্বর্ণ ও রৌপ্য।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের নামায পড়ার জন্য মসজিদে নববীতে এলেন। হযরত সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.) অত্যন্ত আনন্দচিত্তে বাহরাইন থেকে আসা বিপুল পরিমাণ রাজস্ব সামগ্রীর সংবাদ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কর্ণগোচর করলেন। কিন্তু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এতে সামান্নতমও প্রভাবিত হলেন না। তিনি যেন এক ভিন্ন ধ্যানে ধ্যানমৌন রইলেন। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন মসজিদ পানে। মসজিদে নববীর বিরাট আয়তনের চত্বরেই বিশাল স্তুপাকারে রাখা ছিলো বাহরাইন থেকে আসা রাজস্ব সামগ্রী। কিন্তু পার্থিব লোভ-লালসা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত পুত চরিত্রের আধার মহানবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটিবার চোখ তুলেও সেদিকে তাকালেন না বরং তিনি সোজা মসজিদের মিহরাবের কাছে চলে গেলেন। ফজরের নামাযে তিনি ইমাম হয়ে নামায পড়ালেন।

নামায শেষ হলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবার ঐ বাহরাইন থেকে আসা রাজস্বের বিশাল স্তুপের পাশে এসে দাড়ালেন এবং সকলকে ডেকে তিনি ঐ রাজস্ব বিতরণ করতে শুরু করলেন। অবিরাম গতিতে বিলিয়ে চললেন সমুদয় সম্পদরাশি। ইতিমধ্যে দেখা গেলো সম্পদের স্তুপ শেষ হয়ে এসেছে। এক সময় দেখা গেলো বিপুল পরিমাণ রাজস্বের একটি সুতাও বাকি নেই, সবই বিতরণ করে দিলেন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। নিজের জন্য, নিজের পরিবারবর্গের জন্য সামান্য কিছুও রাখলেন না তিনি।

পার্থিব লোভ-লালসামুক্ত নির্লোভ জীবনের এর চাইতে উত্তম ও পরিস্কার দৃষ্টান্ত আর কি হতে পারে ?

আজ লোভলালসার কারণেই দুনিয়ায় কত রকম অঘটন ঘটছে, বিচ্ছিন্ন হচ্ছে কত আপন জন। শেষ করে দিচ্ছে কত আদম সন্তান তাদের দ্বীন-ঈমান। তাই আসুন! আমরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নির্লোভ জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি, তবেই আমরা খুঁজে পাবো সত্তিকারে আলোর সন্ধান পাবো সকল বিপর্যয় থেকে পরিত্রাণ।

তাক্বওয়া

চারটি উট। 'ফদাক' নামক অঞ্চল থেকে পাঠানো হয়েছে রাজস্ব সামগ্রী হিসেবে। ইতিপূর্বে সকলকেই রাজস্ব থেকে বন্টন করা হয়েছে। উটগুলো দেয়ার মত কাউকেও খুঁজে পাওয়া গেলো না। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ সংবাদ জানানো হলো। এখনো উটগুলো বন্টন করা হয়নি জেনে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অস্থির হয়ে গেলেন। পবিত্র মুখে উচ্চারণ করলেন, "দুনিয়াদারীর এ সম্পদ বণ্টিত হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত আমি ঘরে ফিরে যাবো না।" নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে রাতে মসজিদে নববীতেই থেকে গেলেন।

আস্তে আস্তে রাত গভীর হলো। আরো সময় কাটলো। সুবহে সাদিক হয়ে গেলো। বিলালী কণ্ঠে ধ্বনিত হলো ফজরের নামাযের আযান। আযান শেষে নামায হলো, দিনের আলো ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। হযরত বিলাল (রাযি.) ছুটে এলেন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে। তিনি এসে জানালেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! গতকালের সে উটগুলো বণ্টন করে দেয়া হয়েছে। সংবাদ শুনে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সস্থির নিঃশ্বাস ফেললেন। তিনি মহান আল্লাহর দরবারে শোকর আদায় করলেন এবং মানসিক প্রশান্তি নিয়ে বাড়ী চলে গেলেন। অন্য একদিনের কথা–

আসরের নামাযের জামা'আত চলছে। নামাযে ইমামতি করছেন স্বয়ং প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, নামায শেষ হলো। সাথে সাথেই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের হুজরা মোবারকে প্রবেশ করলেন। এ ব্যতিক্রমী বিষয়টি লক্ষ্য করে সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.) বিস্মিত হলেন। সকলে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকলেন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্য। কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে এলেন তিনি। সকলের কৌতুহল মিটাতে তিনি বললেন, তোমরা আমার হাতে যে স্বর্ণের খণ্ডটি দেখতে পাচ্ছো, গতকাল থেকেই এটি আমার ঘরে ছিলো। গতকালের মধ্যেই এটি কাউকে দান করে দেয়ার ইচ্ছা ছিলো কিন্তু তেমন সুযোগ হয়ে উঠেনি, তাই এটি নিয়ে এলাম। এরপর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেটি দান করে দিলেন।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তিকাল সহ্যায় সায়িত থাকা অবস্থার কথা। হঠাৎ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্মরণে এলো যে, ঘরে কিছু আশরাফী (স্বর্ণ মুদ্রা) রয়ে গেছে। তৎক্ষণাৎ তিনি হুকুম করলেন, ওগুলো দান করে দাও। এরপর তিনি ইরশাদ করলেন,

"মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্য এটা শোভা পায় না যে, সে তার শ্রষ্টা আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থিত হতে যাচ্ছে আর তখনো তার ঘরে আশরাফী পড়ে আছে।" আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার !!

উত্তম লেন-দেন

প্রিয় নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাত খালী। কিছু টাকার প্রয়োজন। বাধ্য হয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন ইয়াহুদী মহাজনের স্মরণাপন্ন হলেন। তার কাছ থেকে তিনি কিছু টাকা করয গ্রহণ করলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছু সময় নিয়ে টাকা পরিশোধের একটা তারিখ নির্ধারিত করে দিলেন। কেটে গেলো কিছুদিন।

করয দাতা ইয়াহুদী এসে হাযির হলো। অথচ করয পরিশোধের দিন এখনো আসেনি। করয পরিশোধের নির্ধারিত তারিখের এখনো তিনদিন বাকী। লোকটি এসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে কর্কশ ভাষায় তার পাওনা টাকা চাইতে লাগলো। শুধু চেয়েই সে ক্ষান্ত হলো না, লোকটি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র শরীর থেকে চাদর ছিনিয়ে নেয়ার ধৃষ্টতা দেখালো। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাপড় ধরে টানা হেঁচড়া করতে লাগলো এবং অশ্লীল ভাষায় গাল-মন্দ করতে লাগলো।

পাশেই দাড়িয়ে ছিলেন হযরত উমর (রাযি.)। তিনি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে এহেন দুর্ব্যবহার বরদাশ্‌ত করতে পারলেন না। তীব্র ক্ষোভে গর্জে উঠলেন "ওরে দুরাচার! তুই যদি আজ এ পবিত্র দরবারে না হয়ে অন্য কোথাও থাকতি আর এ ধরণের বেয়াদবী মূলক আচরণ করতি, তবে আমি তৎক্ষণাৎ তোর গর্দান উড়িয়ে দিতাম"

উত্তম আদর্শের মূর্তপ্রতীক প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত উমর, (রাযি.) কে ধমক দিয়ে বললেন, উমর! (রাযি.) তুমি চুপকর, তোমার একাজ আমার পসন্দ হয়নি। তোমার বরং উচিৎ ছিলো, আমাকে তার পাওনা পরিশোধ করে দিতে বলা আর তাকে ভদ্র ভাবে তার

পাওনা চাইতে শিক্ষা দেয়া। অতঃপর হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত উমর (রাযি.)কে বললেন, এ লোকটির পাওনা পরিশোধ করে দাও। আর তাকে যেহেতু তুমি ধমক দিয়েছো তাই তার নির্দ্ধারিত পাওনার পরিমাণ থেকে দেড়গুন পরিশোধ কর। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নির্দেশ পেয়ে হযরত উমর (রাযি.) তাই করলেন।

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এহেন অসাধারণ নম্রতা দেখে লোকটি অত্যন্ত প্রভাবিত হলো। আশ্চর্য সে উত্তম আচরণের পরশে তৎক্ষণাৎ লোকটি পড়ে নিল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ! এভাবে সে ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হলো।

বর্তমানে আমরা এ সুমহান আদর্শপূর্ণ আচরণ থেকে কত দূরে। আর তাই আমরা আমাদের সমাজে হৃদ্যতার পরিবর্তে দেখতে পাচ্ছি বিবাদ-বিসংবাদ, হিংসা-বিদ্বেষ আর ঝগড়া-কলহ।

মহান আল্লাহই পারেন আমাদেরকে হিফাযত করতে, তিনিই পারেন সে মহান আদর্শের শিক্ষায় আমাদেরকে শিক্ষিত করে ধন্য করতে।

স্বনির্ভরতা

রবিউল আউয়াল মাস। যে মাসে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ধরাধামে আবির্ভূত হয়ে ধূলীর ধরাকে ধন্য করেছিলেন। দুনিয়ার প্রচলিত প্রথায় যে মাসে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্মদিন উদযাপন করার কথা ছিলো। কিন্তু জন্মদিন নয় বরং প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সে রবিউল আউয়াল মাসে জীবন রক্ষার কৌশল নিয়ে ভাবতে হচ্ছে। জন্মদিন পালনের মত অহেতুক কাজে সময় নষ্ট করার মত সময় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাতে থাকবে কি করে ? আর ইসলামতো কোন অহেতুক কাজ কর্মে মত্ত থেকে সময়ের মত অমূল্য রত্ন বরবাদ করে দেয়ার বিষয়টি কোন দিনও সমর্থন করে না।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মক্কা হতে মদীনায় হিজরত কালীন সময়ের কথাই বলছিলাম। সকলের সম্মিলিত পরামর্শের ভিত্তিতে কুরাইশ গোষ্ঠী নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে

চিরতরে শেষ করে দেয়ার অশুভ নেশায় হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ঘরের চতুষ্পার্শে নগ্ন তরবারী হাতে দণ্ডায়মান। মহান আল্লাহর নির্দেশে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ বাড়ি থেকে বেরিয়ে হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাযি.)-এর বাড়ী গেলেন এবং বললেন, এখনই আমার সাথে তোমার হিজরত করতে হবে। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাযি.) পূর্ব থেকেই দু'টি উট হিজরতের জন্য প্রস্তুত রেখেছিলেন। তৎক্ষণাৎ উট দুটি হাযির করে তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ উট দু'টো আমি হিজরত সফরের জন্যই প্রস্তুত রেখেছি। এর একটিতে আপনি আরোহন করবেন, আর অপরটিতে আমি আরোহন করবো।

এহেন চরম সংকটাপন্ন মুহূর্তেও প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ স্বকীয়তা ও আত্মনির্ভরতাকে ভুলে যাননি। বরং তিনি তৎক্ষণাৎ হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.) কে জিজ্ঞাসা করলেন, প্রতিটি উটের মূল্য কত পড়েছে ? হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাযি.) উটের মূল্য বলে দিলেন। সাথে সাথে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাযি.)কে একটি উটের মূল্য পরিশোধ করে দিলেন এবং বললেন, একটিতে যেহেতু আমি চড়বো তাই একটির মূল্য দেয়া আমার কর্তব্য।

এ মূল্য তিনি পরেও পরিশোধ করতে পারতেন, কিন্তু তিনি এমনটি চাননি যে, মূল্য পরিশোধের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তা খানিকটা বিলম্বিত হোক। বরং টাকা পরিশোধ করেই তবে তিনি তাতে আরোহন করলেন।

এ কঠিন সংকটের মুহূর্তেও স্বকীয়তা ও স্বনির্ভরতার প্রতি এতটুকু সচেতন দৃষ্টি রাখার মত নযীর এটিই হয়তো প্রথম স্থাপিত হয়েছিল।

সম্মান বোধ

কোন এক রাতের কথা। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদ থেকে বেরোচ্ছিলেন। সাথে ছিলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সম্মানিতা পত্নী উম্মুল মুমিনীন হযরত সুফিয়া (রাযি.)। এরই মধ্যে দু'জন আনসারীকে দেখতে পেলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তারা সেপথ ধরে কোথাও যাচ্ছিলেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখে তাঁরা একটু দ্রুত পায়ে হেটে চলে যাচ্ছিলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে ডাকলেন।

তাঁরা কাছে এলেন। এবার তিনি তাঁদেরকে বললেন, আমার সাথে যে মহিলাকে তোমরা দেখতে পাচ্ছো সে আমার স্ত্রী সুফিয়া (রাযি.)।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র যবানে এহেন বক্তব্য শুনে আনসারীদ্বয় সীমাহীন অস্থির হয়ে গেলেন। তাঁরা বলতে লাগলেন, সুবহানাল্লাহ! ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি একি বলছেন ? আপনার ব্যাপারেও কি কোন কুধারণা পোষণের মত ধৃষ্টতা আমরা দেখাবো ?

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত শান্ত কণ্ঠে বললেন, কুধারণা পোষণের ব্যাপার নয়, সংসয়-সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া তো স্বাভাবিক। কারণ শয়তান মানবদেহের শিরা উপশিরায় প্রবেশ করে থাকে বিধায় আমার খেয়াল হলো যে, শয়তান হয়তো প্রবঞ্চনার মাধ্যমে তোমাদের মনে কোন কুধারণা সৃষ্টি করে দিতে পারে। তাই তোমাদেরকে ডেকে আমি বিষয়টা পরিস্কার করে দিলাম।

বিষয়টি ভেবে দেখলে বুঝা যাবে, মানব জীবন কত সাবধানতার সাথে চালানো প্রয়োজন। আমরা সংসয় দূরীভূত করার প্রয়াশ তো দূরের কথা কৃত্রিম ভাবে মানুষের মনে অহেতুক সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি করাতেই যেনো বেশী তৎপর।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ শিক্ষাকে সামনে রেখে চললে আমরা পরস্পরের প্রতি অহেতুক ও অবাস্তব অনেক সন্দেহ ও কুধারণা পোষন থেকে বেঁচে থাকতে পারি। রক্ষা পেতে পারি কুধারণা কেন্দ্রিক ঝগড়া-কলহ ও বিবাদ-বিসংবাদ থেকে। সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে শান্তি, সম্পৃতি ও সৌহার্দ্য।

বাস্তবতা বোধ

কতগুলো কচি-কাঁচা একত্রিত হয়ে আনন্দ ফূর্তি করছে। অতীত দিনের বর্ণনা সম্বলিত সংগীত গাইছে। ওরা সকলেই ছিলো মেয়ে। মেয়েলী শিশু কণ্ঠের সম্মিলিত সুরের তালে যেন ওরা পথ প্রান্তর গুঞ্জরিত করে তুলেছিলো। এক পর্যায়ে ওরা নিজেদের সৌভাগ্যের বর্ণনা দিয়ে বললো, "আমাদের মাঝে এমন একজন নবী আছেন, যিনি বলে দিতে পারেন আগামীকাল কি ঘটবে"

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে পথ ধরে কোথাও যাচ্ছিলেন। তিনি কচি কচি বাচ্চা মেয়েদের চোখ জুড়ানো সে দৃশ্য দেখতে পেলেন। তিনি শুনলেন ওদের সু মধুর কণ্ঠের মিষ্টি কথা "আমাদের মাঝে এমন একজন নবী আছেন, যিনি বলে দিতে পারেন আগামীকাল কি ঘটবে" সাথে সাথে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাচ্চাদের বারণ করলেন তিনি শিশুদের বললেন, "একথা বলো না-এর আগে যা বলছিলে তাই বলতে থাকো"।

অন্য একদিনের কথা–

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পুত্র হযরত ইবরাহীম (রাযি.) যেদিন ইন্তেকাল করলেন, ঘটনাক্রমে সেদিন সূর্য গ্রহণ হলো। লোকেরা বলতে লাগলো, আজ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পুত্র বিয়োগে সূর্যও শোক পালন করছে। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কানে একথা পড়তেই তিনি সকলকে ডেকে একত্রিত করলেন এবং লোকদের এ ভুল ধারণার আপনোদন কল্পে এক বিশেষ বক্তব্য পেশ করলেন, যার সারমর্ম ছিলো নিম্নরূপ ঃ

"সূর্য তার নির্ধারিত গতিপথেই বিচরণ করে থাকে, কারো ইন্তিকালে সূর্য শোক পালন করে না বা সূর্য গ্রহণ হয় না। আজকের এ সূর্য গ্রহণও কারো ইন্তিকালের কারণে নয়, বরং সূর্যের স্বাভাবিক গতি-ধারাতেই আজ সূর্য গ্রহণ অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

নিজের সার্থ জলাঞ্জলী দিয়ে এধরণের বাস্তব ও সঠিক বক্তব্য তুলে ধরার মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের আজ বড়ই অভাব। আর এই একটি অভাবই সমাজে সৃষ্টি করেছে আরো অগনিত অভাব-অনটন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাস্তবতা বোধের অনুপম দৃষ্টান্ত উপরের দু'টি প্রসংগ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আমারা আমাদের মাঝে বাস্তবতাবোধ সৃষ্টি করতে পারি। পূরণ করতে পারি এর অভাব জনিত কারণে সৃষ্ট সমাজের সমূহ অপূর্ণতা।

ন্যায় পরায়নতা

এক মহিলা চুরি করলো। নাম তার ফাতিমা। বিচার এলো প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে। ইসলামী শরীয়তের কানূনের ব্যাপারে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত কঠোর। তাই তিনি তাকে যথাযথ শাস্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

মহিলা কুরাইশ বংশের ছিলো বিধায় অনেকের ধারণা হলো যে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ কুরাইশ বংশের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করে হয়তো তাকে ক্ষমা করতে পারেন। তাই তারা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অত্যন্ত প্রিয় এক সাহাবীর মাধ্যমে সুপারিশ করালো। সে সাহাবী ছিলেন হযরত উসামা ইবনে যাইদ (রাযি.)। যাকে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যাধিক মহব্বত করতেন। সুপারিশ শুনে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত উসামা (রাযি.) কে বললেন, তুমি কি আমাকে আল্লাহ পাকের বিধানের ব্যাপারে ছাড় দিতে সুপারিশ করছো ? তুমি শুনে রাখো আজ ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অর্থাৎ আমার আদরের কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করতো তবে আমি তাকেও শাস্তি দিতে সামান্যতমও কুণ্ঠাবোধ করতাম না।

অন্য এক সময়ের কথা–

হযরত আব্বাস (রাযি.) মুসলমানদের হাতে বন্দী। কারণ তিনি তখনো ছিলেন অমুসলিম। বদর যুদ্ধে কাফিরদের দলভূক্ত হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসে তিনি ধরা পড়েছিলেন। বন্দীরা যাতে পালিয়ে যেতে না পারে সে জন্য তাদের সকলকে বেঁধে রাখা হলো। শক্ত করে বাঁধা হয়েছিলো বিধায় তার ব্যথায় হযরত আব্বাস (রাযি.) কোঁকাতে ছিলেন। এ অবস্থা লক্ষ্য করে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানসিকভাবে অস্থিরতা অনুভব করতে থাকলেন। নিজের চাচা আজ ভাতিজার হাতে বন্দী। হৃদ্যতা, আন্তরিকতা সব আছে তার পরেও এক্ষেত্রে কিছু করার নেই কারণ ইসলামের নিরাপোষ নীতির বাগডোরেই তিনি আটকে পড়েছেন।

সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.) প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অস্থিরতা অনুভব করতে পেরে হযরত আব্বাস (রাযি.)-এর বন্ধন ঢিলা করে দিলেন। একথা জানতে পেরে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এধরণের বৈষম্য মোটেও ঠিক নয় বরং সকল বন্দীদের সাথে সম পর্যায়ের আচরণ করতে হবে। সুতরাং তোমরা হয়তো আমার চাচার ন্যায় সকল বন্দীদের বন্ধন ঢিলা করে দাও আর না হয় অন্যদের ন্যায় আমার চাচা হযরত আব্বাস (রাযি.)-এর বন্ধন পূর্বের ন্যায় শক্ত করে দাও।

বর্তমান সমাজে এ জাতীয় ইনসাফপূর্ণ, স্বজন প্রীতিহীন আচরণ অনেকটা রূপ কথার মতো মনে হলেও প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছেন। যে শিক্ষা ও আদর্শের কোন বিকল্প নেই।

দয়া ও অনুগ্রহ

মক্কার কুরাইশ কাফিরগোষ্ঠী প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে চালিয়ে যাচ্ছে বিভিন্নমুখী ষড়যন্ত্র। চলছে ইসলাম ও কুফরের এক অঘোষিত যুদ্ধ। সুযোগ পেলেই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিংবা তাঁর অনুসারীদের প্রাণে মেরে ফেলতেও যাদের সামান্নতম কুণ্ঠা নেই বরং সে চেষ্টাতেই যারা অহর্নিশ ব্যাপৃত, এমনি অবস্থার কথা।

মক্কায় ভয়ানক দুর্ভিক্ষ চলছে। ক্ষুধার তাড়নায় লোকেরা হাড্ডি, মুর্দারসহ ইত্যাকার নিন্দনীয় ও হারাম বস্তুসমূহ খেতে শুরু করেছে। এ খবর শুনেই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হৃদয়মন দারুনভাবে মর্মাহত হয়ে উঠলো। সাথে সাথে দু'হাত উচিয়ে তিনি মহান আল্লাহর শাহী দরবারে ফরিয়াদ করতে লাগলেন অথচ তিনি যাদের জন্য দু'আ করছেন তারাই তাঁর প্রাণের দুশমন।

উহুদ প্রান্তরে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জীবনে শেষ করে দেয়ার জন্য কাফির গোষ্ঠী আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত করা হয়েছে, দানদান মুবারক শহীদ করা হয়েছে। এত অত্যাচারের পরেও সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.) যখন বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি এ পাশণ্ড দুরাচারদের বিরুদ্ধে আল্লাহপাকের দরবারে বদ দু'আ করুন। করুণার আধার প্রিয় নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বললেন, কস্মিন কালেও নয়। কারণ আমি কারো প্রতি বদ দু'আ বা অভিসম্পাত করার জন্য প্রেরিত হয়নি, বরং আমি করুণা বা রহমত হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। অতঃপর বদ দু'আর পরিবর্তে এই বলে তিনি দু'আ করলেন, ইয়া আল্লাহ! আমার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে আপনি ক্ষমা করে দিন, তাদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দিন, তারা আমাকে চিনতে পারেনি যে, আমি সত্যিই আপনার নবী।

দয়া, করুণা ও অনুগ্রহ প্রদর্শনের এর চাইতে বড় দৃষ্টান্ত আর কি হতে পারে ? আজো আমাদের সমাজে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ শিক্ষার যথার্থ বাস্তবায়ন সম্ভব হলে, হিংসা ও জিঘাংসাপূর্ণ এ দুনিয়ায় পুনরায় শান্তি ও সুখের পুণ্য প্রিযুষ ধারা প্রবাহিত হতে পারে।

ক্ষমা প্রদর্শন

ইসলামের একজন বড় দুশমন। কাফির কুরাইশ নেতা। যার বিভিন্ন ষড়যন্ত্রে শত শত মুসলমানের প্রাণ বিপন্ন হয়েছে। তারই হাতে নির্যাতিত নিপীড়িত হয়েছে অগণিত মুসলামন।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রিয় সাহাবী হযরত আবু সুফিয়ান (রাযি.)-এর কথাই বলছিলাম। তিনি তখনো ছিলেন অমুসলিম। ইসলাম গ্রহণের পরে যিনি মুসলিম শক্তি বর্ধনে উল্লেখযোগ্য ভাবে সহযোগিতা করেন। যিনি অংশগ্রহণ করেন ইতিহাস খ্যাত হুনাইন, তাইফ, ইয়ারমুকসহ অসংখ্য রক্তক্ষয়ী মুসলিম অভিযানে।

ঐতিহাসিক মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে তিনি পরাজিত শত্রুর ন্যায় এসে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে হাযির হলেন। দয়া ও ক্ষমার মূর্তপ্রতীক প্রিয় নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অন্তরে তখন যেন করুণার সাগরে বান ডাকলো। দয়া অনুগ্রহের ঢেউ উথলে উঠলো নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হৃদয়মনে। সে দয়ার বারি ধারায় হযরত আবু সুফিয়ান (রাযি.) এমন ভাবে শিক্ত হলেন যেন তিনিই ইসলামের সবচাইতে বড় খাদেম। ক্ষমার নিদর্শন সরূপ নবীকণ্ঠে উচ্চারিত হলো "আজ হতে আবু সুফিয়ানের (রাযি.) বাড়ীর চতুস্পার্শের সীমানা মধ্যস্থ এলাকা হবে "নিরাপদ এলাকা"। আবু সুফিয়ান নিজেই শুধু নয় বরং তার বাড়ীতে সে যতজনকে আশ্রয় দিবে তারা সকলেই আজ নিরাপদ থাকবে।"

মক্কা বিজিত হলো। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিজয়ী রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে মক্কা নগরীতে প্রবেশ করলেন। পবিত্র বাইতুল্লাহ শরীফের কাছে গেলেন। নেতা-অনুসারী নির্বিশেষে মক্কার ছোট বড় সকলেই আজ ভীত সন্ত্রস্ত। পুরোনো দিনে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি কৃত দুর্ব্যবহার, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর অমানবিক নির্যাতন-নিপীড়ন সবই তাদের স্মরণে ছিলো। তারাই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র বদনে পাথর নিক্ষেপ করেছিলো, উটের পচা নাড়ী-ভূড়ী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর গায়ে চাপিয়ে দিয়েছিলো, গলায় কাপড়

পেঁচিয়ে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম করেছিলো। এ জাতীয় হাজারো নির্যাতন যারা করেছিলো তারাইতো আজ এখানে উপস্থিত। অত্যাচার আর নির্যাতনে জর্জরিত করে এ মক্কা ও বাইতুল্লাহ শরীফ থেকে একদিন যাকে বের করে দেয়া হয়েছিলো, আজ তিনিই এ মক্কার রাষ্ট্র প্রধান, তাঁর হাতেই আজ মক্কা নগরীর সমুদয় ক্ষমতা।

ইতিমধ্যেই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পবিত্র বাইতুল্লাহ শরীফ থেকে মূর্তি নিধন কার্য সমাধা করে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলেন কা'বা চত্বরে। সমবেত অত্যাচারী কুরাইশ সম্প্রদায় ভয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগলো, তাদের নিশ্চিত ধারণা "শাস্তি তো আমাদেরকে আজ পেতেই হবে কিন্তু কি হবে সে শাস্তি! না জানি কত কঠোরই হবে আমাদের মাত্রারিরিক্ত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত আজ আমাদের ভোগ করতে হবে। তবে তারা শুধু ভাবছিলো, সে শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হয় কিনা। আজ শুধু মৃত্যুদণ্ডের হাত থেকে বেঁচে যেতে পারলেই তাদের যেন সোনায় সোহাগা। আর কিছুই যেন তারা চায় না।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তুলনাহীন করুণার আধার। মহান আল্লাহ তাকে ঘোষণা করেছেন ''রাহ্মাতুললিল আলামীন" বা গোটা বিশ্ব জগতের জন্য রহমত বা মূর্ত করুণা হিসেবে। উদারতা ও ক্ষমার শ্রেষ্ঠতম আদর্শ মহানবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র যবান থেকে এহেন মুহূর্তে যে বাণী বেরিয়ে এলো, তাই এখানে লক্ষ্যণীয়। তিনি বললেন, যা হওয়ার হয়ে গেছে, তোমাদের ব্যাপারে আজ আমার কোন অভিযোগ নেই, তোমাদের সকলের প্রতি আমি আজ সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করছি।

বিশ্ব ইতিহাসের পাতা তন্য তন্য করে খুঁজলেও ক্ষমা ও অনুগ্রহের এহেন নযীর দ্বিতীয় আরেকটি খুঁজে পাওয়া যাবে না। বর্তমান হত্যা-সন্ত্রাস, হিংসা জিঘাংসা, প্রতিশোধ স্পৃহায় উন্মত্ত, আদর্শ ও নৈতিক দিক থেকে বিধ্বস্ত এ সমাজ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ক্ষমার এহেন আদর্শ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সার্বিক অধঃপতনের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে, প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সমাজে শান্তি, নিরাপত্তা ও সৌহার্দ্যের এক মোহনীয় পরিবেশ।

বীরত্ব

সঙ্কাপূর্ণ এক ভয়াল রজনী। মদীনাবাসী ভীত শঙ্কিত। একটি ভয়ঙ্কর ভীতিপ্রদ শব্দ শ্রুত হলো। শত্রু আক্রমনের তীব্র আশঙ্কা। সকলেই অস্থির, হতভম্ব, হত বিহ্বল। কারো চোখে ঘুম নেই। কখনো বা কেউ একটু বিছানায় গা এলিয়ে দিচ্ছে আবার সাথে সাথে উঠে দাড়াচ্ছে। ডানে বামে তাকাচ্ছে, এই বুঝি আক্রমণ হলো। কারো মনে শান্তি নেই, নেই সস্তি।

বিকট শব্দটি কিসের তা অনুসন্ধান করে জানা প্রয়োজন। কিন্তু কারোই সাহস হচ্ছে না সেদিকে অগ্রসর হতে। অবশেষে তারা সকলে একত্রিত হয়ে ভয়ে ভয়ে সামনে অগ্রসর হওয়ার ইচ্ছা করলো। ইতিমধ্যেই দেখা গেল, যেদিক থেকে সে বিকট শব্দটি শ্রুত হয়েছিলো, সেদিক থেকে একজন ঘোড় সাওয়ার এগিয়ে আসছেন। কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়ালেন সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.)। দেখা গেল তিনি আর কেউ নন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। হাতে তার উম্মুক্ত তরবারী। তিনি ঐ বিকট ভয়ানক শব্দটি শুনার সাথে সাথে একাই তরবারী কাঁধে ঝুলিয়ে, ঘোড়ার পৃষ্ঠে আরোহণ করে সমগ্র শহরতলী এলাকা পরিদর্শন করে এসেছেন। সকলকে অভয় দিয়ে তিনি বললেন, তোমাদের আর অনুসন্ধান করতে যেতে হবে না, আমি একাই সম্পূর্ণ এলাকা ঘুরে তল্লাসী করে এসেছি, ভয়ের কোন কারণ নেই, তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ বাড়ীতে চলে যাও, গিয়ে আরাম করো, কোন সমস্যা হলে আমিই তা দেখবো ইনশাআল্লাহ।

এভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেশের জনসাধারণ তথা উম্মতের নিরাপত্তা ও দেশ রক্ষার ক্ষেত্রে বিপদশঙ্কুল পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপ্রধান হয়েও ত্যাগ তিতিক্ষা এবং আত্মনিবেদনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন নির্ভীকচিত্তে। যে বীরত্ব ও সাহসিকতায় সকল অপশক্তির হৃদে কম্পন সৃষ্টি হয়েছে। ইসলাম বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে এক মহান ও বিজয়ী আদর্শ হিসেবে।

বর্তমান বিশ্বে এহেন ত্যাগ ও আত্ম নিবেদনের দৃষ্টান্ত শুধু দুস্প্রাপ্যই নয় বরং তা অসম্ভবও বটে। চরম বিলাসিতা আর আরামপ্রিয়তায় আচ্ছাদিত বর্তমান রাষ্ট্রপ্রধান আর প্রশাসকদের এসবকিছু ভাববার সময় কোথায় ? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ উন্নত ও আদর্শ শাসননীতি থেকে দীক্ষা গ্রহণের তৌফীক তাদের হবে কি ?

দৃঢ়তা

ইতিহাসখ্যাত হুনাইন যুদ্ধ। বার কিংবা চৌদ্দ হাজার মুসলিম সৈন্যের বিশাল বাহিনী। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন সে বাহিনীর প্রধান সেনাপতি। মুসলিম সৈন্য সংখ্যার আধিক্যে কাফের সৈন্যরা ভয় পেয়ে গেলো। তাই তারা এক গোপন ফন্দি আঁটলো। তারা একটি গুপ্তস্থানে লুকিয়ে থেকে তথা হতে হঠাৎ মুসলিম বাহিনীর প্রতি বৃষ্টির ন্যায় তীর নিক্ষেপ করতে লাগলো। মুসলিম সেনাবাহিনী কিছু বুঝে উঠার আগেই তাদেরকে ছত্র-ভঙ্গ করে দেয়া হলো।

কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে মুসলিম বাহিনী বিভিন্ন দিকে ছুটে পালাতে লাগলো। এ চরম বিভীষিকাপূর্ণ মুহূর্তেও দৃঢ়তার বেনযীর আদর্শ, নির্ভীক সিপাহসালার প্রিয়নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোড়ার পিঠ থেকে এক লাফে নেমে একাই মুকাবিলার জন্য দাড়িয়ে গেলেন। মুসলিম সৈন্যরা যখন এদিক ওদিক ছুটে পালাচ্ছিলো তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শত্রুদের উদ্দেশ্যে সাহসী ও নির্ভীক কণ্ঠে বুলন্দ আওয়াযে বলতে লাগলেন, ''আমি কোন মিথ্যা নবী নই, আমি আবদুল মুত্তালিবের বংশোদ্ভূত নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

হযরত আব্বাস (রাযি.) এ দৃশ্য অবলোকন করে (প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইশারায়) চিৎকার মেরে মুসলিম সৈন্যদের ডাকতে লাগলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই মুসলিম সেনা বাহিনীর চৈতন্য ফিরে এলো। তারা পুনরায় ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় এসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চার পাশে জড়ো হলো। ক্ষণিকের মধ্যেই যুদ্ধের মোড় পাল্টে গেলো। ময়দানে মুসলিম সৈন্যদের বিজয়ের পাল্লা ভারী হয়ে উঠলো। মুসলিম সৈন্যদের হাতে অমুসলিম বাহিনী সাংঘাতিকভাবে মার খেলো। তারা পালহীন মেষের ন্যায় এদিক ওদিক ছুটোছুটি করে পালিয়ে জীবন বাঁচালো।

এ কথা বাস্তব সত্য যে, এ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় অনেকটা নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দৃঢ়চিত্ততা ও নির্ভীক মনোবলই আল্লাহপাকের সাহায্যে এ যুদ্ধে মুসলিম সৈন্যদের বিজয় লাভের পথ সুগম করেছে। মুসলমানদের নিশ্চিত পরাজয়ের হাত থেকে উদ্ধার করে তাদের বিজয় মাল্যে ভূষিত করেছে।

বিশ্ব ইতিহাসে অসংখ্য দৃঢ়তার আলোচনা এসেছে। এ দুনিয়া অনেক সাহসিকতার ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে। কিন্তু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে যে দৃঢ়তা ও সাহসিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তা নিঃসন্দেহে এক ব্যতিক্রমী ও বেনযীর দৃষ্টান্ত।

বিলাস বিহীন জীবন

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিম রাষ্ট্র সমূহের রাষ্ট্রপ্রধান। বাইতুল মালসহ রাষ্ট্রের বিভিন্ন অর্থ সম্পদ তারই হাতের মুঠোয়। যখন যা ইচ্ছা তিনি যে কোন খাতে ব্যয় করার পূর্ণ অধিকার রাখেন। কিন্তু তিনি তো তাঁর অধিকারকে হিসাব-নিকাশ করে প্রয়োগ করবেন। কারণ তিনি দুনিয়ায় প্রেরিত হয়েছেন গোটা বিশ্ব মানবের মু'আল্লিম বা শিক্ষকরূপে।

আর তাই রাষ্ট্র প্রধান হয়েও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের ঘর তৈরী করলেন খেজুর গাছের খুঁটি আর আড়া দিয়ে। সে ঘর এতই সংকীর্ণ ছিলো যে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহাজ্জুদের নামাযে দাড়ালে বিবি আয়িশা (রাযি.) তার সামনে সায়িত অবস্থায় থাকতেন। হযরত আয়িশা (রাযি.)-এর পা ছড়ানো থাকলে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিজদা করতে পারতেন না। হযরত আয়িশা (রাযি.) পা গুটালে তিনি সিজদা করতে পারতেন। উচ্চতাও এত কম ছিলো যে, মাত্র দশ বার বৎসরের কোন বালকও সে ঘরের ছাদ হাত দ্বারা নাগাল পেতো।

নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর গৃহের দরজায় লটকানো ছিলো লোমের চট। অনেক সময় এমন হতো যে দীর্ঘ একমাস ধরেও তাঁর চুলায় আগুন জ্বলতো না। শুধু শুকনো খেজুর আর পানি পান করেই পরিবারবর্গ জীবন যাপন করতেন। কখনো বা রুটি খেতেন, তবে তাও কোন উন্নতমানের মিহিন ময়দার রুটি নয় বরং তা ছিলো জবের খশখশে রুটি। গমের রুটি আর গোস্ত খুব কমই জুটতো। পাতলা চাপাতি রুটি তৈরীর কথা যেনো কল্পনাও করা যায় না। জামা কাপড় ছিড়ে গেলে তা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ হাতে তালী লাগাতেন। জুতা ছিড়ে গেলে তাও তিনি নিজ হাতেই সেলাই করতেন।

লক্ষ-কোটি সরকারী আয়ের মুদ্রা যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাতে বণ্টিত হতো। কত গরীব-অনাথ অসহায় তারই আর্থিক

আনুকূল্য লাভে পরিতৃপ্ত হয়েছে। কিন্তু সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিজের অবস্থা একটু তাকিয়ে দেখলে, তার প্রতি একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে সুস্থ্য মনের অভ্যন্তরে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাই একজন পথ ভোলা মানুষকে সঠিক পথে এনে দিতে সক্ষম হতে পারে। আমরা কি পারি না বিষয়গুলোকে একটু ভেবে দেখতে ?

শান্তি কামিতা

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আজ অসহায় নন। তার সাথে পনেরো শত জানবায সাহাবীর (রাযি.) এক বিশাল কাফেলা। একটি মাত্র আংগুলির ইশারায় তারা সব লণ্ড-ভণ্ড করে দিতে পারেন, কারণ এ পনেরো শত দুর্দমনীয় সৈন্যের মাত্র তিনশত তের জন সৈন্য বদর প্রান্তরের রনসাজে সজ্জিত প্রায় এক হাজার কাফির সৈন্যকে চরমভাবে পর্যুদস্ত করে দিয়েছিলেন।

ঐতিহাসিক হুদাইবিয়ার সন্ধির কথাই বলছিলাম। পনেরো শত সাহাবীর এক বিশাল বাহিনী নিয়ে তিনশত মাইল দীর্ঘপথ অতিক্রম করে মক্কার উপকণ্ঠে, মক্কানগরী থেকে মাত্র নয় মাইল দূরে অবস্থিত ঐতিহাসিক হুদাইবিয়ায় এসে পৌঁচেছেন (বর্তমানে যে স্থানটি সুমাইসিয়া নামে পরিচিত)। কিন্তু মক্কাবাসীরা আল্লাহর ঘর যিয়ারতে বাধা দিলো। তার গতিপথ রুদ্ধ করে দিলো, আর একটুও সামনে আগাতে দিবে না।

চরম উত্তেজনার এহেন মুহূর্তে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করলেন– "মহান আল্লাহর সম্মানিত নিদর্শনসমূহের সম্মান ক্ষুন্ন না হয়। এরূপ যে কোন শর্ত মুশরিকরা আরোপ করে – আজ আমি তা মেনে নিব।"

সন্ধির কথা আলোচনা হলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা মেনে নিলেন। সন্ধিপত্রের গায়ে "বিসমিল্লাহ" লিখায় মুশরিকরা আপত্তি জানালো। আর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নামের সাথে "রাসূলুল্লাহ" শব্দ লিখায় তারা তার বিরোধিতা করলো। তিন শত মাইল অতিক্রম করে এত কাছাকাছি এসেও আল্লাহ পাকের ঘর যিয়ারত না করেই পুনরায় ফিরে যাওয়ার শর্ত আরোপ করলো।

শান্তির বার্তাবাহক, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার মহান অগ্রদূত, একমাত্র শান্তি রক্ষার মহান লক্ষ্যে উপরোক্ত কথাগুলোসহ আরো অনেক অবাঞ্ছিত ও অযৌক্তিক কথা-বার্তা সব মেনে নিয়ে মক্কার মুশরিকদের সাথে দশ বৎসর

মেয়াদী 'যুদ্ধ নয় শান্তি' চুক্তি সম্পাদন করে পুনরায় ফিরে এলেন। শক্তি সামর্থ থাকা সত্ত্বেও এহেন অযৌক্তিক ও অন্যায় শর্তাবলী মেনে নিয়ে শুধু শান্তি প্রতিষ্ঠা ও তা অক্ষুন্ন রাখার জন্য প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে মহান ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিলেন, তা যুগ যুগ ধরে শান্তিকামী বিশ্ববাসীর কাছে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

অপূর্ব আচরণ

ইসলাম ও মুসলমানদের বিরোধিতা করার কোন সুযোগই হাত ছাড়া করেনি ওরা, ছাড়েনি মুসলমানদের ক্ষতিসাধনের কোন ফাঁক-ফোকড়। ওরা মুনাফিক, ওদের সরদার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিরুদ্ধে সারাটা জীবন ষড়যন্ত্র করেছে। ধোঁকা-প্রতারণা করে মুসলমানদের অগ্রযাত্রাকে বাধাগ্রস্থ করার চেষ্টায় লিপ্ত ছিলো সদা সর্বদা। সর্বপরি উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযি.)-এর পবিত্র চরিত্রে কলঙ্ক লেপে দেয়ার ব্যর্থ চেষ্টায়ও সে মুনাফিক সরদার মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে।

এত কিছুর পরেও উত্তম আদর্শের মূর্তপ্রতীক প্রিয়নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সদা-সর্বদা তার প্রতি সদাচরণ প্রদর্শন করেছেন। এ মুনাফিক সরদার দূরাচার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই যখন অন্তিম সহ্যায় সায়িত তখন স্বয়ং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এক বিশেষ আবদার জুড়ে দেয়। সে বলে, আমার একটি অন্তিম বাসনা হচ্ছে, আপনি দয়া করে আপনার একটি জামা আমার কাফন হিসেবে দান করুন এবং আপনার কাছে আমার অনুরোধ যে, আপনি আমার জানাযা নামায পড়াবেন।

আবদুল্লাহ ইবনে উবাই একথা ভাল ভাবেই জানতো যে, একমাত্র ইসলামই সঠিক ও সত্য ধর্ম, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই হক ও সত্যনবী কিন্তু সেতো আজীবন সে ধর্ম এবং তার বাহক নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে তার কুটিল স্বভাব হেতু বিদ্বেষ প্রদর্শন করেছে। এখন মউতের সময় সে কাফনের জন্য নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জামা দেয়ার জন্য এবং তার জানাযা স্বয়ং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে পড়ানোর জন্য অনুরোধ করলো যাতে এ অসীলায় তার পরকালে নাজাতের পথ সুগম হয়।

হযরত উমর (রাযি.) মুনাফিক সরদারের অতীত অপকর্মসমূহের কথা উল্লেখ করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তার আবদার পূরণে সম্মত না হওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু রহমতে আলম, দয়ার সাগর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবনে উবাইর উভয় আবদারই পূর্ণ করতে সম্মত হলেন এবং পরে তা তিনি বাস্তবেও পূর্ণ করলেন। এবং বললেন, আমাকে যদি একথা বলা হতো যে, সত্তরের অধিকবার মাগফিরাতের দু'আ করলে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে তবে আমি তার জন্য তার চাইতেও অধিক বার দু'আ করতাম।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অপূর্ব আচরণে মুনাফিকদের মাঝে দারুন প্রভাবের সৃষ্টি হলো। তারা আস্তে আস্তে খাঁটি ও প্রকৃত মুসলমান হয়ে যেতে লাগলো।

উদারতা

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকলকে কল্যাণের পথে ডাকছেন। ডাকছেন সত্যধর্ম ইসলামী আদর্শ গ্রহণের জন্য। কিন্তু কাফির বেঈমানদের জন্য তা ছিলো গাত্রদাহের কারণ। বাপ-দাদার ধর্মের দোহাই দিয়ে তারা হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক আনীত সঠিক ও সত্য ধর্ম ইসলামের আওয়াযকে স্তব্ধ করে দেয়ার চেষ্টায় লিপ্ত ছিলো অহর্নিশি। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবনের দুশমন ছিলো তারা।

এমনি এক কাফির প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাড়ীতে মেহমান হলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বেশ কয়েকটি দুধের বকরী ছিলো। প্রথমতঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে আন্তরিকভাবে অতিথি হিসেবে বরণ করলেন, অতঃপর তিনি একটি বকরীর দুধ তাকে এনে দিলেন। লোকটি ছিলো কিছুটা পেটুক ধরণের। সে এক চুমুকেই তা সাবাড় করে আরো চাইলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরেকটি বকরীর দুধ এনে তার সামনে হাযির করলেন। লোকটি তাও পান করে নিলো এবং আরো দুধ চাইলো। এভাবে লোকটি একে একে ঘরের সাতটি বকরীর দুধ সব পান করে সাবাড় করলো।

কাফির লোকটি আসলে এধরনের অসৎ উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছিলো, যাতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঘরের সকলকে সহ অভুক্ত থাকতে হয়। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কু মতলব টের পেয়েছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তাকে কিছুই বলেননি বরং তার কথা মত তাকে বার বার দুধ এনে দিয়েছেন। লোকটিও সব একের পর এক খেয়ে সাবাড় করেছে।

জীবনের দুশমন কাফিরের প্রতি এহেন উদার আতিথ্য প্রদর্শন শুধু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দ্বারাই সম্ভব। কারণ তিনি ছিলেন সীমাহীন উদার। যে উদারতাকে আকাশের উদারতার সাথে তুলনা করলেও কম হয়।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এহেন বেনযীর উদারতায় ঐ কাফির লোকটি দারুনভাবে প্রভাবিত হলো। সে ভাবতেও পারেনি তার প্রতি এত সুন্দর আচরণ করা হবে। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ মোহনীয় আদর্শ তাকে আকর্ষণ করলো, সে দ্বীন ইসলামের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়লো। এক পর্যায়ে সে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাতে একমাত্র সত্যধর্ম ও জীবন বিধান ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হলো।

সহযোগিতা

মক্কা বিজিত হওয়ার পর পবিত্র সে নগরী সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হলো। বিভিন্ন এলাকায় অবস্থানরত লোকেরাও তখন মক্কা নগরীতে প্রত্যাবর্তন করার সাহস ও সুযোগ পেলো। মক্কা বিজয় পরবর্তী সে সময়ে হাকীম ইবনে হিযাম ইসলামী ভূখণ্ডে প্রবেশ করলেন। তিনি ছিলেন আর্থিক দিক থেকে দুর্বল ও দুঃস্থ। একবার তিনি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে হাযির হয়ে কিছু সাহায্য সহযোগিতা চাইলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কিছু সাহায্য দিয়ে দিলেন। তিনিও সেদিনের মত চলে গেলেন।

কিছুদিন পর আবারো একদিন তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে এসে হাযির হলেন এবং পুনরায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে কিছু সাহায্য প্রার্থনা করলেন। এবারও

প্রিয় নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কিছু সহানুভূতি প্রদর্শন করলেন। সাহায্য পেয়ে এবারও আনন্দচিত্তে তিনি ফিরে গেলেন। এরপর আবার একদিন তৃতীয় বারের মত তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে কিছু সাহায্য প্রার্থনা করেন। এবার হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাকীম ইবনে হিযামকে উপদেশ দিয়ে বললেন, হাকীম ! যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যকে সাহায্য করে মহান আল্লাহ তার ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে দেন। আর যার মধ্যে লোভ থাকে আর সে লোভের বশীভূত হয়ে অন্যের কাছে প্রার্থনার হাত প্রসারিত করে, সে সর্বদাই অতৃপ্ত থাকে এবং কখনোই পরিতৃপ্ত হতে পারে না। মনে রেখো, দাতার হাত গ্রহিতার হাত অপেক্ষা উত্তম। অর্থাৎ কারো দান পাওয়ার আশায় থাকার চাইতে কাউকে দান করতে পারা উত্তম।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ নিষ্ঠাপূর্ণ উপদেশ বাণীতে হাকীম ইবনে হিযাম ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হলেন, তিনি তখনই প্রতিজ্ঞা করলেন, আর কোনদিন তিনি কারো কাছে দুনিয়ার কিছু প্রার্থনা করবেন না।

এরপর থেকে তিনি আর কোনদিন কারো কাছে কিছুই চাননি। এমনকি কখনো প্রয়োজন বোধ করলেও তিনি অন্য কারো কাছে প্রার্থনা করা থেকে অত্যন্ত কঠোর ভাবে বিরত থেকেছেন।

পরামর্শ দান

একজন সাহাবী (রাযি.)। অত্যন্ত অসহায় জীবন যাপন করছেন। তিনি হাযির হলেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র দরবারে। ''হুযূর! আমাকে কিছু সাহায্য করুন আমি বড়ই অসহায়'' অত্যন্ত বিনয়ের সাথে ফরিয়াদ জানালেন সাহাবী (রাযি.)।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভিক্ষাবৃত্তি পসন্দ করতেন না, বরং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শিক্ষা ছিলো ভিক্ষা করা পরিহার করে নিজের বাহুবলে খেটে খাবে। তিনি সাহাবী (রাযি.) কে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কাছে বিক্রি করার মত কোন বস্তু আছে কি ? সাহাবী (রাযি.) জবাব দিলেন, আমার কাছে একটি বিছানা আর একটি

পেয়ালা আছে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে সাহাবী (রাযি.) কে সেগুলো নিয়ে আসতে বললেন। হুকুম মত সাহাবী (রাযি.) বিছানা ও পেয়ালা এনে হাযির করলেন। অতঃপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে এ দু'টো বস্তু খরিদ করার মত কেউ আছে কি ?

একজন সাহাবী বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমি এক দিরহাম মূল্যে এ বস্তুগুলো খরিদ করতে প্রস্তুত আছি। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, এক দিরহামের চেয়ে বেশী মূল্যে খরিদ করার মত কেউ আছে কি ? অন্য একজন সাহাবী (রাযি.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি এ দুটি বস্তু দুই দিরহাম দিয়ে খরিদ করতে রাযী আছি। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বিতীয় সাহাবীর (রাযি.) কাছে দুই দিরহামের বিনিময়ে তা বিক্রি করে তার কাছ থেকে মূল্য আদায় করে ঐ দুঃস্থ সাহাবী (রাযি.) কে তা দিয়ে বললেন, নাও এ দু'দিরহামের এক দিরহাম দিয়ে আজকের খানা-দানার ব্যবস্থা কর। আর এক দিরহাম দিয়ে বাজার থেকে একটি রশি ক্রয় করে আনো। (কোন কোন বর্ণনায় একটি কুঠার কিনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে) অতঃপর তা দ্বারা জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে এবং লাকড়ী কুড়িয়ে এনে বাজারে বিক্রি কর। এবং তার উপার্জন দ্বারা সংসার চালাতে থাক।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদেশ মতে সে সাহাবী (রাযি.) কাজ করতে লাগলেন, এবং আস্তে আস্তে মহান আল্লাহ তার সকল অভাব দূরীভূত করে দিলেন। ধীরে ধীরে তিনি কিছু অর্থ সঞ্চয় করতেও সক্ষম হলেন। এভাবে তিনি খুব আরামে দিন গুযরান করতে লাগলেন।

প্রায় দু'সপ্তাহ পরে ঐ সাহাবীর (রাযি.) সাথে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাক্ষাত হলে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে তার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে সাহাবী (রাযি.) নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানালেন, হুযূর! আমি এখন যথেষ্ট আরামে আছি, আল্লাহপাক আমার অভাব দূরীভূত করে দিয়েছেন। এখনও আমার হাতে পনেরো দিরহাম সঞ্চিত রয়েছে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবার ঐ সাহাবী (রাযি.)

কে পরামর্শ দিলেন, ঐ সঞ্চিত অর্থের অর্ধেক দিয়ে তুমি তোমার স্ত্রী পুত্র পরিজনের জন্য ব্যবহারের কাপড় খরিদ কর। আর বাকী অর্ধেক দ্বারা ঘরের প্রয়োজনীয় খাবার ক্রয় করে নিয়ে যাও।

এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে সাহাবী (রাযি.)কে জিজ্ঞাসা করলেন, এবার তুমি বলো তোমার কাছে কি এভাবে পরিশ্রম করে নিজের বাহুবলে জীবিকা উপার্জন করা ভাল মনে হয়, নাকি ভিক্ষাবৃত্তি অধিক পসন্দনীয় বলে মনে হয় ? মনে রেখো দুনিয়াতে যারা ভিক্ষাবৃত্তি করবে পরকালে আল্লাহ পাকের দরবারে তারা অপমানিত হয়ে উঠবে।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দেয়া উপদেশ ও পরামর্শ হযরত সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.) দিল ও জানে মেনে নিতেন এবং তার উপর আমল করতেন। এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পরামর্শের উপর কাজ করে তারা তার সুফল ও লাভ করেছন।

এভাবেই একজন অভাবগ্রস্থ লোককে প্রিয়নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভিক্ষাবৃত্তি থেকে ফিরিয়ে এনে স্বনির্ভর জীবন গড়ার পথ বাতলে দিলেন।

দুঃস্থ জীবন যাপন

''দুঃস্থতাই আমার জন্য গৌরব"– প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের এ চিরন্তন বাণীর আলোকেই নিজ জীবন পরিচালনা করতেন। তিনি অধিক ধনবান হওয়ার প্রতি মোটেও আগ্রহী ছিলেন না। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু পাওয়া যেতো তাতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকতেন। অল্পে তুষ্টি ছিলো নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একটি অন্যতম সার্বক্ষণিক আদর্শ।

একবার হযরত আবু তালহা (রাযি.) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মসজিদের অভ্যন্তরে শুয়ে থাকা অবস্থায় দেখতে পেলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন ছিলেন খুবই ক্ষুধার্ত।

হযরত আবু তালহা (রাযি.) বলেন, আমি দেখলাম– নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্ষুধার জ্বালায় বার বার শুধু এপাশ ওপাশ করে পার্শ পরিবর্তন করছেন।

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করতেন আদর্শ সন্তানের জন্য শুধু কয়েকটি বস্তুই যথেষ্ট। এ ছাড়া দুনিয়ায় তাদের আর কিছুর প্রয়োজন নেই ১. বসবাসের জন্য একটি ঘর। ২. দেহ আবৃত করে রাখার জন্য একটু কাপড়। ৩. জীবন ধারণের জন্য কিছু আহার্য ও পানীয়।

দু'জাহানের সরদার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ঘরে অধিকাংশ সময়েই খাবার কিছুই থাকতো না। একাধারে কয়েকদিনও তিনি অভূক্ত থেকেছেন। হযরত আইশা সিদ্দীকা (রাযি.) বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পূর্ণ জীবনে কোন দিনও দুইবেলা তৃপ্তি ভরে আহার গ্রহণ করেননি।

আমানত দারী

যাকে জীবনে শেষ করে দেয়ার জন্য বুনা হচ্ছে হাজারো ষড়যন্ত্রের জাল। যার অস্তিত্ব, যার আদর্শের প্রসার এক মুহূর্তের জন্যও সহ্য হয় না। তার কাছেই গোপনে গচ্ছিত রাখা হচ্ছে নিজেদের টাকা-কড়ি।

এ অবিশ্বাস্য বাস্তব বিষয়টিই সংঘটিত হয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ব্যাপারে। কাফির বেঈমান গোষ্ঠী সর্বদাই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ক্ষতি সাধনের চেষ্টায় লেগে থাকতো। আবার গোপনে তার কাছেই গিয়ে জমা রাখতো তাদের টাকা-কড়ি।

হিজরতের রাতের কথা। সে রাতে কাফিরদের ঐক্যবদ্ধ পরামর্শের ভিত্তিতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দুনিয়া থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় করে দেয়ার কুমতলবে নবী গৃহের চারপাশে যখন ওরা ওঁৎপেতে বসে গেলো তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহান আল্লাহর নির্দেশে হিজরতের জন্য বেরোবার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু তাঁর কাছে যে রয়েছে অনেক কাফির মুশরিকের টাকা, যা তারা আমানত রেখেছে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী (রাযি.)কে নিজ বিছানায় শুইয়ে দিলেন। তাঁকে প্রধানতঃ দায়িত্ব দেয়া হলো নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট কাফির কুরাইশদের আমানত রাখা টাকাগুলো তাদের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য। টাকাগুলো যথাযথভাবে মালিকের হাতে পৌঁছে দেয়ার পর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকেও মদীনায় হিজরত করার জন্য বলে দিলেন।

হযরত আলী (রাযি.) যদিও হিজরতের সময় প্রিয় নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হিজরত সফরে সঙ্গী হওয়ার জন্যই এখনো মক্কায় থেকে গিয়েছিলেন। কিন্তু আরেকটি বিশেষ প্রয়োজনে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাঁকে রেখে যাবেন বলে জানালেন, তৎক্ষণাৎ তিনি তাতে সম্মতি জানালেন এবং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নির্দেশ মতে আমানতকারীদের টাকা-কড়ি যথাযথভাবে পৌঁছে দিলেন এবং পরে তিনিও হিজরত করলেন। ঐতিহাসিক কোবা পল্লীতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অবস্থানকালে তিনি তার সাথে গিয়ে মিলিত হলেন।

এভাবেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যথাযথ আমানতদারী সংরক্ষণ করেছেন। এমনকি জীবন নাশের চরম আশঙ্কাজনক মুহূর্তেও তিনি অন্যের রাখা আমানতের কথা ভুলে যাননি।

গোলামের প্রতি দয়া

আপন গোলামকে বেদম প্রহার করে চলছেন একজন সাহাবী। নাম তার হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রাযি.)। হয়তো কোন অন্যায় করেছে গোলাম। ইতিমধ্যেই সেখানে আগমন করলেন মমতার আধার রহমতে আলম প্রিয়নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম । গোলামকে প্রহার করতে দেখে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হৃদয়মনে দারূণ ব্যথা পেলেন। হায় এতো অধিনস্ত গোলাম একে প্রহার করলে বাধা দেয়ার তো কেউ নেই। আর তাই হয়তো সে প্রহৃত হচ্ছে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, আবু মাসউদ! এ গোলাম তোমার অধীনস্ত। এর উপর

তোমার যে পরিমাণ অধিকার রয়েছে, মনে রেখো তুমিও আল্লাহ পাকের অধীনস্ত, তোমার উপর মহান আল্লাহ পাকের এর চাইতেও বেশী অধিকার রয়েছে।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দয়া-মায়াপূর্ণ ভাষায় বলা এ কথাগুলো শ্রবণে হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রাযি.) দারুনভাবে প্রভাবিত হলেন, অত্যন্ত অস্থির হয়ে তিনি বলতে লাগলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! আমি এখনই এ গোলামকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় আযাদ করে দিলাম। এখন থেকে সে মুক্ত। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রাযি.)-এর এহেন উদারতা প্রদর্শনে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে বললেন, তুমি যথার্থই করেছো, এমনটি না করলে পরকালে জাহান্নামের আগুন তোমাকে স্পর্শ করে বসতো।

এভাবেই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাকর-গোলামদের প্রতি সহানভূতি প্রদর্শন করেছেন। গোলাম আযাদ করার প্রতি তিনি সকলকে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করেছেন। এ কাজে তিনি অনেক ফযীলতের কথা শুনিয়েছেন। নিজেও অনেক গোলাম মুক্ত করে অন্যদেরকে গোলাম মুক্তির বাস্তব শিক্ষা দান করেছেন। যার ফলে ধীরে ধীরে সমাজ থেকে দাস-প্রথার বিলুপ্তি ঘটেছে। চাকর-গোলামেরা তাদের ন্যায্য অধিকার ও পাওনা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। ভৃত্তদের প্রতি যত্র-তত্র অত্যাচার বন্ধ হয়ে সমাজে সুখ-শান্তি ফিরে এসেছে।

আদর-সোহাগ

করুনার আধার প্রিয়নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে শিশু হযরত হুসাইন (রাযি.) খেলা-ধূলা করছিলেন। দৃশ্যটি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চোখে খুব ভাল লাগলো তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন সেখানে। এরপর এক সময় তিনি হযরত হুসাইন (রাযি.)-এর দিকে উভয় বাহু সম্প্রসারিত করেদিলেন। হযরত হুসাইন (রাযি.) খেলার ছলে প্রিয় নানাজীর দিকে হাসতে হাসতে

দৌড়ে এলেন। কিছু দূর এসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাতে ধরা না দিয়েই আবার পিছন দিকে ফিরে গেলেন।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুনরায় শিশু হযরত হুসাইন (রাযি.)-এর দিকে উভয় হস্ত সম্প্রসারিত করে দিয়ে তাঁকে কাছে ডাকলেন। এবারও তিনি হাসতে হাসতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দিকে এগিয়ে এসে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাতে ধরা না দিয়ে পুনরায় পিছন দিকে ফিরে গেলেন। এভাবে কয়েকবার করার পর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার হযরত হুসাইন (রাযি.) কে ধরে ফেললেন, এবং তাকে স্বস্নেহে আদর করে চুমো খেলেন অতঃপর এক হাত মাথায় এবং অপর হাত থুতনীর উপর রেখে তাকে নিজ বক্ষে জড়িয়ে ধরলেন। আদর ও স্নেহের আতিসহ্যে একবার নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে উঠলেন, "হুসাইন (রাযি.) আমার আর আমি হুসাইনের (রাযি.)"।

শিশুদের কাছে পেলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যথেষ্ট আদর সোহাগ করতেন। তাদের কাছে টেনে কোলে নিতেন, আদর করে চুমো খেতেন। কোন মজলিসে কোন ভাল সুস্বাদু ফল হাদিয়া এলে সে মজলিসে কোন শিশু উপস্থিত থাকলে তিনি সে শিশুকেই তা দান করতেন। তাদের ভাল কিছু খাওয়াতে পারলে তিনি আত্মিক তৃপ্তি লাভ করতেন।

একদিনের কথা–

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়েকটি শিশুকে আদর সোহাগ করছিলেন, সে সময় সেখানে এক বেদুঈন এসে হাযির হলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শিশুদের প্রতি এহেন আদর সোহাগ করতে দেখে বেদুইন আশ্চর্য হলো, সে বললো, আপনারা শিশুদের এভাবে আদর-স্নেহ করেন অথচ আমার দশ-দশটি সন্তান থাকা সত্ত্বেও আমি কোনদিন তাদেরকে এভাবে আদর করিনি। বেদুঈনের কথায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খানিকটা রাগ হলো, তিনি বেদুঈনকে লক্ষ্য করে বললেন, মহান আল্লাহ যদি তোমার অন্তর থেকে মায়া-মহব্বত ছিনিয়ে নিয়ে থাকেন, তবে আমি আর কি করবো ?

গরীবের প্রতি ভালবাসা

গরীব মুহাজিরদের এক জামাত বসে আছে মসজিদে নববীর এক পার্শে। সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাযি.) একাকী বসে আছেন তার অদূরেই। এমনি সময়ে সেখানে উপস্থিত হলেন সাইয়্যেদুল কাওনাইন হযরত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম । তিনি অত্যন্ত আগ্রহ ভরে ঐ গরীব মুহাজিরের সাথে গিয়ে বসে পড়লেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযি.) বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বসতে দেখে আমিও আমার স্থান থেকে উঠে গিয়ে সে কাফেলার সাথে বসে পড়লাম। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবার উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করলেন, গরীব মুহাজিরদের জন্য সুসংবাদ। কারণ তারা ধনী ও বিত্তবানদের চাইতে চল্লিশ বৎসর পূর্বে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র যবানে এ সুসংবাদ শুনে দুঃস্থ মুহাজিরগণ অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযি.) বলেন, আমি লক্ষ্য করে দেখলাম, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একথা শুনার পর উপস্থিত মুহাজিরগণের চেহারা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। কিন্তু আমার মনটা তখন আক্ষেপে ভরে উঠলো, আমি অনুসোচনাপূর্ণ মনে কল্পনা করতে থাকলাম, হায়! আমিও যদি এই সহায় সম্পদহীন গরীব মুহাজিরদের মত হতাম তবে তো আমিও এ সু সংবাদের অন্তর্ভূক্ত হতে পারতাম।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুঃস্থদের অত্যন্ত ভাল বাসতেন তাদেরকে কাছে রাখতেন এবং তাদের অভাব পুরণ করার চেষ্টা করতেন। একবার নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আইশা সিদ্দীকা (রাযি.) কে বললেন, হে আইশা! তোমার দরজা থেকে কোন মিসকীনকে খালি হাতে ফেরৎ দিবে না। উপস্থিত যা আছে তাই তাদের হাতে তুলে দিবে। যদি আর কিছু দেয়া সম্ভব না হয় তবে অন্ততঃ এক টুকরা খেজুর হলেও তাদেরকে দান করবে।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, হে আইশা! গরীব লোকদিগকে ভালবাসবে, এবং তাদের সাথে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন

করবে। এমনটি করলে মহান আল্লাহও তোমাকে তার ঘনিষ্ঠজনদের অন্তর্ভূক্ত করে নিবেন।

এভাবেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাজে কর্মে নিজেও যেমন গরীব দুঃখী অসহায়দের প্রতি দয়া-মায়া ও ভালবাসা প্রদর্শন করতেন তেমনি অন্যদেরকেও তা করার জন্য উৎসাহ-উদ্বিপনা দান করতেন।

কথা রক্ষা

ইসলাম ও মুসলমানদের একজন উঁচু দরের দুশমন। নাম তার কা'আব ইবনে যুহাইর। উত্তেজনাকর বক্তৃতা ও আকর্ষণীয় কবিতা পাঠে তার ব্যাপক প্রসিদ্ধি ছিলো। এসব কবিতা আবৃত্তি করে এবং ইসলাম ও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে সে কুরাইশদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতো।

কা'ব ইবনে জুহাইরের এ অবস্থা বেশী দিন স্থায়ী হলো না। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মোহনীয় আদর্শ ও অতুলনীয় চরিত্র মাধুরী তাকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করলো। সে নিজের ভুল বুঝতে পেরে সেজন্য অনুতপ্ত হলো এবং যথেষ্ট লজ্জা অনুভব করতে লাগলো। কিন্তু সে যে জঘন্য অপরাধী। তার সে অপরাধ কি ক্ষমার যোগ্য ? মোটেই না। এ কারণে সে কিছুতেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত হতে সাহস পেলো না।

একদিনের কথা–

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে নববীতে সমবেত সাহাবায়ে কিরামের (রাযি.) উদ্দেশ্যে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। কা'ব চিন্তা-ভাবনা করে একটি নুতন বুদ্ধি আবিষ্কার করলো। সে নিজের পোষাক-আষাক বদল করে নিজের সূরত পরিবর্তন করে ফেললো, এবং ভয়ে ভয়ে সে মজলিসে গিয়ে উপস্থিত হলো।

কিছুক্ষণ চুপ-চাপ মজলিসে বসে থেকে এক পর্যায়ে সুযোগ বুঝে সে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছাকাছি চলে গেলো এবং হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি যদি কা'বকে আপনার দরবারে এনে হাযির করি, তবে আপনি কি তার অতীত অপরাধসমূহ মার্জনা করে তাকে গ্রহণ করবেন ? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ– আমি তাকে গ্রহণ করবো এবং তার অতীত অপরাধসমুহ ক্ষমা করে দিব। সুযোগ বুঝে সাথে সাথে কা'ব বলে উঠলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমিই সে হতভাগা কা'ব। ভয়ে আমি আমার সূরত পরিবর্তন করে এসেছি।

কা'বের অপকর্মের কথা সকলেরই জানা ছিলো, তাই তার নাম শুনলেই মুসলমানগণ ক্ষেপে উঠতেন। এবার তাঁরা কা'বকে নিজেদের নাগালে পেয়ে এক্ষণি তাকে নিঃশেষ করে দিতে চাইলেন। কিন্তু দয়ার নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকলকে বারণ করে দিয়ে বললেন "কা'ব যত বড় অপরাধী হোক না কেন আমি তাকে নিরাপত্তা দান করেছি, সুতরাং সে সম্পূর্ণ নিরাপদ। তোমরা তাকে কিছুই বলো না। আল্লাহু আকবার কতবড় ক্ষমার নযীর স্থাপিত হলো এখানে। কত উদার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, কত মহান তিনি।

উন্নত ব্যবহার

মক্কা বিজিত হলো। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেন। এমনকি বড় বড় দাগী আসামীরাও প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সে অফুরন্ত ক্ষমার প্রস্রবণে শিক্ত হলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদর্শের অভূতপূর্ব পরশে সকলেই অভিভূত হলো। তারা ইসলামের মহাত্ম্য বুঝতে পেরে দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলো। গোত্রে গোত্রে তারা ইসলামী কাফেলায় শরীক হতে থাকলো। কিন্তু একটি গোত্র এখনো ইসলাম গ্রহণ করেনি। সে গোত্রটির নাম "বনু হানীফা"। এটিই সে পাশণ্ড দুরাচারের গোত্র যে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবদ্দশায় ভণ্ড নবুওওতের দাবীদার হওয়ার দুঃসাহস দেখিয়েছিলো। সে পাষণ্ড ছিলো ভণ্ড মুসাইলামাতুল কায্যাব।

সে বনু হানীফা গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলো সুমামা ইবনে আসাল। ঘটনাক্রমে সে বন্দী হলো। তাকে ধরে এনে মদীনায় প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে হাযির করা হলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে মসজিদে নববীর খুঁটির সাথে বেঁধে রাখার নির্দেশ দিলেন।

অতঃপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে নববীতে উপস্থিত হয়ে তার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলে সে জবাব দিলো, আপনি যদি আমাকে হত্যা করেন তবে একজন খুনীকেই যে হত্যা করলেন, তাতে সন্দেহ নেই। আর যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেন তবে আপনি একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তির প্রতিই অনুগ্রহ করলেন। এছাড়া আমাকে মুক্ত করে দেয়ার পরিবর্তে আপনি যদি বিনিময় দাবী করেন তবে নিঃসন্দেহে আমি তা পূরণ করবো।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সব শুনে কিছু না বলেই সেদিন চলে গেলেন। দ্বিতীয় দিন সুমামার অবস্থা সম্পর্কে পুনরায় জানতে চাইলে সে আজো একই জবাব দিলো। তৃতীয় দিন আবার নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলেন। আজো সে পূর্বের মতই জবাব দিলো। এবার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুমামার বাঁধন খুলে তাকে মুক্ত করে দেয়ার আদেশ দিলেন। হুকুম মত তাকে মুক্ত করে দেয়া হলো। সুমামা তার প্রতি এ অপ্রত্যাশিত অনুকম্পা প্রদর্শনে দারুণভাবে প্রভাবিত হলো। তৎক্ষণাৎ সে একটি গাছের আড়ালে গিয়ে গোসল করে পবিত্র হলো এবং মসজিদে নববীতে গিয়ে সকলের সামনে কালেমা পাঠ করে পবিত্র ইসলাম গ্রহণ করে নিলো।

এরপর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! দুনিয়াতে আপনিই আমার কাছে সবচাইতে নিন্দার পাত্র ছিলেন। কিন্তু এখন দুনিয়াতে আপনার চাইতে অধিক প্রিয় আমার কাছে আর কেউ নেই। আপনার ধর্মই আমার কাছে ছিলো সব চাইতে নিন্দনীয় আর এখন আমার কাছে সে আনিত ধর্মই সবচাইতে অধিক প্রিয়। আপনার শহরটি আমার কাছে সবচাইতে অপ্রিয় ছিলো কিন্তু সেটিও এখন আমার কাছে সারা দুনিয়ার মাঝে শ্রেষ্ঠ জনপদ।

অসাধারণ ধৈর্য্য

সম্পূর্ণ নির্লোভ, নিরহংকার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। অসংখ্য সোনা-রূপার অলংকারাদি এনে হাযির করা হলো নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সামনে। এসব দিয়ে তিনি কি করবেন ? তিনিতো ধন-সম্পদ জমা করার জন্য দুনিয়ায় আসেননি। তৎক্ষণাৎ তিনি সেসব স্বর্ণ-চান্দীর অলংকারসমূহ অত্যন্ত ন্যায় ও ইনসাফের সাথে বণ্টন করে দিলেন।

এ অবস্থা দেখে একজন গ্রাম্য মূর্খ্য লোক সেখানে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত অভদ্র ভাষায়, বেয়াদবসুলভ ভঙ্গিতে বললো, ওহে মুহাম্মদ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার তো ধারণা যে, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে অবশ্যই ইনসাফ করার নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু আমি তো আপনাকে সে ধরণের ইনসাফপূর্ণ আচরণ করতে দেখলাম না।

এ ক্ষেত্রে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম না হয়ে অন্য কেউ হলে এ গ্রাম্য মূর্খ্যের তৎক্ষণাতই বারটা বাজিয়ে ছাড়তো। তার বর্ণনাভঙ্গী এমন ছিলো যে, অন্য যে কেউ হলে তা সহ্য করতে পারতো না বরং নিজের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলতো। আর ঐ বেয়াদবকে কঠোর থেকে কঠোর শাস্তি প্রদান করতো। কিন্তু প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন ক্ষমা ও উত্তম আদর্শের মূর্ত প্রতীক। সদাচরণ ছিলো তাঁর মজ্জাগত। শত কষ্টের মোকাবেলায়ও সামান্য প্রতিশোধ পরায়নতা যিনি দেখাতে যাননি কোনদিন। বরং দুশমনকেও যিনি শান্তি ও নিরাপত্তা দিয়েছেন সর্বদা।

এ দুরাচার বেয়াদবের কথার জবাবে রহমতে আলম হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত দয়াদ্র কণ্ঠে বললেন, আল্লাহ পাক তোমার মঙ্গল করুন, আমিই যদি ইনসাফের সাথে কাজ না করি তবে আমার পরে আর কেইবা তোমার সাথে ইনসাফের আচরণ করবে ?

এরপর লোকটি যখন সেখান থেকে ফিরে যেতে লাগলো, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন অন্য একজনকে বললেন, ঐ লোকটিকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে এসো। কথামত তাকে ডেকে আনা হলো। যখন লোকটি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এলো তখন তিনি অত্যন্ত নম্র কণ্ঠে তাকে বণ্টনের বিষয়টি বুঝালেন এবং

বিভিন্ন শান্তনা বাণী তাকে শুনালেন। এভাবে অত্যন্ত নম্র ও সদাচরণের মাধ্যমে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকটির মধ্যকার সকল সংশয় ও সন্দেহ দূরীভূত করে দিলেন। এমনিভাবেই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত গোশ্বা ও রাগের ক্ষেত্রগুলোতেও অসাধারণ ধৈর্য্য ও আশ্চর্য সদাচরণ প্রদর্শন করে মানুষের মন জয় করতেন। কারো অন্যায়ে তার উপর ক্ষেপে যেতেন না। কারো দুর্ব্যবহারে তার প্রতিশোধ নিতেন না।

বেনযীর মমতা

ইয়াহুদীদের অসহ্য উৎপাৎ, সহ্যসীমা অতিক্রম করে গেছে যা অনেক আগেই। ওয়াদা ভংগের অপরাধে যে গাদ্দারদের মদীনা হতে বহিষ্কার করে দেয়া হয়েছিলো। মদীনা থেকে অপসারিত হয়ে তারা খাইবরে তাদের আস্তানা স্থাপন করলো। সেখানেও ওরা চুপ থাকতে পারলো না। বরং স্বভাব সুলভ ভাবে বিভিন্ন কৌশলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যেতে লাগলো। গোপনে প্রকাশ্যে করে চললো বিভিন্ন জ্বালাতন।

শেষ পর্যায়ে মুসলমানগণ অতীষ্ট হয়ে খাইবর আক্রমন করলেন। মহান আল্লাহ পাকের সীমাহীন নুসরতে সেখানে মুসলমানগণ বিজয়লাভ করলেন। খাইবর বিজিত হলো, তথায় উড্ডিন হলো ইসলামের হেলালী নিশান। ইয়াহুদীদের বড় বড় অনেক লিডার সেখানে মারা গেলো। অনেকে মুসলমানদের হাতে বন্দী হলো, ইয়াহুদীদের বড় সরদার হুয়াই ইবনে আখতাব ও সেখানে মুসলিম সৈন্যদের হাতে মারা পড়লো। বন্দীদের মধ্যে ইয়াহুদী নেতা হুয়াই ইবনে আখতাব -এর কন্যা সুফিয়াও ছিলো। যে ছিলো মুসলমানদের সবচাইতে বড় দুশমনের কন্যা। তরবারীর এক আঘাতে তাকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেয়াই ছিলো তৎকালীন সময়ের চাহিদা। কিন্তু এখানে বিষয়টি ঘটলো তার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে এসে লোকেরা আরয করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! সুফিয়া ইয়াহুদ সরদারের কন্যা, যদি আপনি তাকে নিজের পত্নী হিসেবে বরণ

করে নেন, তবে ইয়াহুদীদের মাঝে এর একটা ভাল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে। পাশাপাশি সুফিয়ার প্রতিও খুব স্নেহ মমতা ও সদাচরণ প্রদর্শন করা হবে।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন ক্ষমার আদর্শ । প্রতিশোধ বা প্রতিহিংসা নয় বরং ন্যায় পরায়নতা, ক্ষমা ও সদাচরণই হলো নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সহজাত অভ্যাস। তাই তিনি বিষয়টি নিয়ে ভাবলেন, তিনি চিন্তা করলেন যদি এর দ্বারা উয়াহুদী সম্প্রদায়ের মাঝে ইসলামের প্রতি কিছুটা আকর্ষণ সৃষ্টি হয় তবেতো আমার এ সামান্য কাজে ইসলাম উপকৃত হবে। অবশেষে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুয়াই ইবনে আখতাবের শত দুশমনী সত্ত্বেও তা ভুলে গিয়ে তারই কন্যা সুফিয়ার প্রতি চূড়ান্ত স্নেহ-মমতা ও অনুকম্পা প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। সুফিয়ার মনতুষ্টি ও তার সম্মান বৃদ্ধির মানসে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে নিজ পত্মী রূপে বরণ করে নিলেন।

এভাবেই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বেনযীর আদর্শ ও অনুকম্পার পরশে মুসলিম বিদ্বেষী হুয়াহুদী সরদারের কন্যা সুফিয়া পরিণত হলো মুসলিম রাহবর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পত্মীতে। সুফিয়া এখন পরিণত হলেন উম্মুল মুমিনীন হযরত সুফিয়া রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা রূপে।

শিক্ষানুরাগ

মাত্র তিন শত তের জন মুসলিম সৈন্য। কাফির সৈন্য সংখ্যা এর তিন গুনেরও বেশী। ঐতিহাসিক বদর প্রান্তর। যুদ্ধ শুরু হলো। সে ছিলো এক তীব্র লড়াই, বাহ্যিক দৃষ্টিতে সরু সমানের বিবেচনায় এ ছিলো এক অসাধারণ ও অসম যুদ্ধ। নেমে এলো খোদায়ী নুসরত। অসাধরণ বিজয় অর্জিত হলো মুসলমানদের। কাফিরদের সত্তরজন মরলো, আরো সত্তরজন হলো বন্দী। এ বন্দীদের নিয়েই কথা।

হযরত উমর (রাযি.)-এর প্রস্তাব ছিলো ইসলামের এ দুশমনদের হত্যা করে ফেলা হোক। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাযি.)-এর প্রস্তাব

ছিলো কিছু মুক্তিপন গ্রহণ করে এদের মুক্ত করে দেয়া। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাযি.)-এর প্রস্তাব পসন্দ করলেন। সেমতে তিনি সামান্য মুক্তিপনের বিনিময়ে তাদেরকে ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করলেন।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন দারুন শিক্ষানুরাগী, শিক্ষাকে সম্প্রসারিত করে নিরক্ষরতা দূরীকরণে তিনি ছিলেন একজন সফল কর্মবীর। বন্দীদের মাঝে কিছু লোক ছিলো শিক্ষিত। শিক্ষানুরাগী মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের শিক্ষার মূল্যায়ন করলেন। তিনি তাদের মুক্তির জন্য কোন আর্থিক মুক্তিপণ ধার্য করলেন না বরং তাদের জন্য তিনি যে মুক্তিপণ ধার্য করলেন তাই ছিলো প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শিক্ষার প্রতি অনুরাগ প্রকাশের এক ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। ইহিহাসে এহেন শিক্ষানুরাগের নযীর দ্বিতীয়টি আর নেই।

প্রিয় নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বললেন, তোমরা প্রত্যেকে দশজন করে আনসার ছেলে-মেয়েদের অক্ষর জ্ঞান শিক্ষা দিবে। এ শিক্ষাদান যখন শেষ হবে তখন তোমরা মুক্ত হয়ে চলে যাবে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ প্রস্তাবে তারা খুব খুশি হলো।

এখানে লক্ষ্যনীয় বিষয় হচ্ছে, শিক্ষার মূল্যায়ন করতে গিয়ে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চরম শত্রুকেও শিক্ষকের মর্যাদা দানে কুণ্ঠাবোধ করলেন না। বরং শিক্ষা সম্প্রসারণের প্রথম সুযোগেই তিনি মদীনার কল্যাণ রাষ্ট্রে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে দিলেন।

এভাবেই ধীরে ধীরে শিক্ষা সম্প্রসারিত হয়। বিভিন্ন পদক্ষেপে মহানবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাতিকে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিয়ে তাদেরকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে উদ্ধার করতে থাকেন। সুতরাং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপন সামগ্রিক গুনাবলীর সাথে সাথে নিরক্ষরতা দূরীকরণেও ব্যাপক অবদান রেখে একজন মহৎ শিক্ষনুরাগী হিসেবে বিশ্ব ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

ক্ষুধার্তকে খাবার দান

চারিদিকে হাহাকার! মদীনায় দুর্ভিক্ষ চলছে। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর বণী আদম। আব্বাস ইবনে শুরাহবিল ক্ষুধায় কাতর। কি করবে কি খাবে কিছুই পাচ্ছে না সে। অবশেষে নিরুপায় হয়ে একটি ফলের বাগানে প্রবেশ করলো। সেখানে রকমারী ফল পেকে আছে। আব্বাস আর ক্ষুধার জ্বালা সইতে পারছে না। সে মালিকের অনুমতি ছাড়াই বাগানের ফল ছিড়ে খেতে লাগলো। ইতিমধ্যে মালিক টের পেয়ে এসে সেখানে হাযির হলো। আর যায় কোথায় ? আব্বাসকে হাতে নাতে ধরে ফেললো বাগানের মালিক। আর অমনি শুরু হলো বেদম প্রহার। এক পর্যায়ে মালিক তার জামা খুলে নিয়ে গেলো।

এখানেই শেষ নয় মালিক লোকটি আব্বাসকে ধরে নিয়ে এলো প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে। বিচার দিলো তার নামে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সব কথা শুনে এক পর্যায়ে ব্যথিত হলেন। বিবাদীর দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী কণ্ঠে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এ লোকটি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত। সে শিক্ষা-দীক্ষা থেকে বঞ্চিত একজন মূর্খ্য মানুষ। সে অন্যের ফল না বলে খাওয়ার অপরাধ সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত নয়। উপরন্ত ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হয়ে নিরুপায় অবস্থায় সে তোমার বাগানের অজস্র ফল থেকে দু'চারটি ফল খেয়েছে মাত্র। এজন্য তোমার তাকে প্রহার করা উচিত হয়নি বরং তোমার উচিত ছিলো এ ব্যাপারে তাকে জ্ঞান দান করা এবং তার ক্ষুধার্ত মুখে কিছু খাবার তুলে দেয়ার ব্যবস্থা করা।

এরপর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মালিক লোকটিকে আব্বাসের জামা ফেরৎ দেয়ার নির্দেশ দিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হুকুম মত লোকটি জামা ফেরৎ দিলো। এবার দয়ার নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের পক্ষ থেকে ক্ষুধার্ত আব্বাস ইবনে শুরাহবিলকে ষাট ছা' (দুই শত দশ সের পরিমাণ) শস্য দান করে তাকে পরিতৃপ্ত করে দিলেন।

এভাবেই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অগণিত ক্ষুধার্তকে খাবার দান করেছেন। অসহায়কে সহায়তা দান করেছেন। দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। যা ছিলো উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য এক বাস্তব শিক্ষা।

আমরা কি ভেবে দেখেছি, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সে শিক্ষা আমরা কতটুকু ধরে রাখতে পেরেছি। আমরা কি ক্ষুধার্ত-পীড়িতদের যথার্থ খোঁজ-খবর নিতে পারছি ? আমাদের সমাজেও এ জাতীয় অজস্র মানুষ অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটায়। আমরা যেনো এক্ষেত্রে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মহান শিক্ষাকে স্মরণ করি।

মোহনীয় আদর্শ

খাইবরের যুদ্ধে মুসলমানগণ বিজয়ী হলেন। অনেক গণীমতের মাল মুসলমানদের হস্তগত হলো। যার মধ্যে ছিলো অনেক স্বর্ণ-চান্দী। শীর্ষস্থানীয় সাহাবী হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.) বলেন, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাইবর যুদ্ধের গণীমতের মালের স্বর্ণ-চান্দিগুলো একত্রিত করার জন্য হযরত বিলাল (রাযি.)-এর কাপড়ের মধ্যে রাখতে থাকলেন। লক্ষ্য হচ্ছে, এভাবে সব স্বর্ণ-চান্দী একত্রিত করে পরে তা তার প্রাপকদের মাঝে বণ্টন করে দেয়া হবে।

এ দৃশ্য দেখে একজনের মাঝে ভুল বুঝের সৃষ্টি হলো। সে ভাবলো নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হয়তো সব স্বর্ণ-চান্দী হযরত বিলাল (রাযি.) কেই দিয়ে দিচ্ছেন। লোকটি তার ভুল ধারণার বহিঃপ্রকাশ ঘটালো। সে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললো, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! ইনসাফের সাথে বণ্টন করুন।

লোকটির এ কথাটি ছিলো প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি একটি বড় আক্রমণ। একটি মানুষের উপর চুড়ান্ত গোস্বা হওয়ার জন্য এ জাতীয় একটি কথাই যথেষ্ট হতে পারে। শক্তি থাকলে এ কথার প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহাও মানুষের মাঝে জন্ম নিতে পারে। কিন্তু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন দয়ার সাগর, তিনি লোকটির উপর কোনরূপ রাগ বা গোস্বা প্রকাশ করলেন না। তিনি শুধু

অত্যন্ত শান্ত ভাষায় লোকটিকে বললেন, আল্লাহপাক তোমার মঙ্গল করুন আমিই যদি ইনসাফ না করলাম তবে কে আর ইনসাফ করবে ? আমি যদি কোনরূপ ইনসাফ পরিপন্থী কাজ করি তবে তো আমি ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো।

সে সময় যেখানে উপস্থিত ছিলেন হযরত উমর (রাযি.)। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি এহেন উক্তি তিনি বরদাস্ত করতে পারছিলেন না। অত্যন্ত গোস্বার সাথে তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! লোকটির কথায় মনে হচ্ছে সে মুনাফিক, সুতরাং আপনার অনুমতি পেলে আমি এ বেয়াদবের গর্দান উড়িয়ে দিতে চাই।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত উমর (রাযি.) কে অত্যন্ত শান্ত কণ্ঠে বারণ করে বল্লেন, আমি কোন সাহাবীকে হত্যার নির্দেশ দেয়া থেকে আল্লাহ পাকের দরবারে পানাহ চাই।

এই ছিলো নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মানুষের প্রতি মোহনীয় আখলাক প্রদর্শনের একটি ছোট্ট দৃষ্টান্ত। এভাবেই অসংখ্য মানুষ মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অতুলনীয় আদর্শের ঝর্ণা ধারায় সিক্ত হয়েছে বার বার।

প্রসস্ত মন

ঐতিহাসিক হুনাইনের যুদ্ধ শেষ হলো। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিরে এলেন মদীনায়। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঘিরে ধরলো গ্রাম্য সাহায্য প্রার্থীরা। তারা অনর্গল সাহায্য প্রার্থনা করতে থাকলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও দুই হাতে তাদেরকে সাহায্য সামগ্রী দিতে থাকলেন। লোকের ভীড় এত অধিক ছিলো যে, তাদের চাপে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি গাছের সাথে গিয়ে লেগে গেলেন। এক পর্যায়ে কেবা কারা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর গায়ের চাদরটি খুলে নিয়ে গেলো। ভীড়ের আধিক্য হেতু চাদরটি কে নিয়ে গেলো তা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুঝতে পারলেন না।

বিষয়টি স্বাভাবিক দৃষ্টিতে চিন্তা করলেও অত্যন্ত গোশ্বার বিষয়। সাহায্য প্রার্থীদের ভীড় আর হৈ চৈ সহ্য করেও তিনি তাদেরকে সাহায্য দিয়ে যাচ্ছেন। এ জন্য তিনি যথেষ্ট কষ্টও স্বীকার করছেন। ভীড়ের চাপে তিনি একটি গাছের সাথে গিয়ে চেপে পড়েছেন, তারপর আবার তার নিজ ব্যবহৃত চাদরের উপর হস্তক্ষেপ। অন্য যে কোন মানুষ হলে এ সময় গোস্বায় ফেটে পড়তো। এবং তাৎক্ষণিকভাবে সাহায্য বিতরণ বন্ধ করে দিয়ে চাদর ছিনতাইকারীকে খুঁজে বের করার জন্য তৎপর হয়ে উঠতো। কিন্তু রহমতের নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন অন্য সকলের চাইতে ব্যতিক্রম। তিনি এ জন্য কোন গোস্বার ভাবই প্রকাশ করলেন না। বরং অত্যন্ত মোলায়েম কণ্ঠে বললেন, আমার গায়ের চাদরটি যেই নিয়েছো সেটি ফেরৎ দিয়ে দাও, কারণ প্রয়োজন ছাড়া আমি কোন বস্তুই রাখি না। তোমরা বিশ্বাস রাখ; আমার কাছে যদি এ মাঠের ঘাসের সংখ্যা পরিমাণের উট থাকতো এবং অসংখ্য পরিমাণের সম্পদও থাকতো তবে আমি তা সবই বন্টন করে দিতাম। তোমাদের মধ্যে কেউই আমাকে সংকীর্ণমনা, কৃপন কিংবা মিথ্যা ও অবাস্তব কথার প্রবক্তা হিসেবে পেতে না। এভাবেই তিনি নিজের গোস্বাকে অবদমিত করে মানুষের সাথে শান্তভাবে কথা বলতেন।

সাহায্য দান

এক ব্যক্তি এসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে হাযির হলো। সে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খিদমতে কিছু সাহায্য প্রার্থনা করলো। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে তখন কিছুই ছিলো না। তিনি অত্যন্ত মোলায়েম ভাবে লোকটিকে বললেন, এখন তো আমার কাছে তোমাকে দেয়ার মত তেমন কিছুই নেই, সুতরাং তুমি কারো কাছ থেকে আমার কথা বলে করয নিয়ে নাও। সে করয পরিশোধের দায়িত্ব আমার উপর থাকবে। যখনই আমার হাতে কিছু আসবে, আমি তার করয পরিশোধ করে দিব। সেখানে উপস্থিত ছিলেন হযরত উমর (রাযি.)। তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ্য করে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম!

মহান আল্লাহ তো আপনাকে আপনার ক্ষমতার বাইরে কোন কাজের নির্দেশ দেননি। হযরত উমর (রাযি.)-এর এ কথা ঐ লোকটির কাছে ভাল লাগলো না। সে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ্য করে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি খরচ করে যেতে থাকুন এবং এ কারণে আপনি দুঃস্থতার আশঙ্কা করবেন না।

লোকটির এ কথা শ্রবণ করে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মুখে মুচকী হাসি ফুটে উঠলো এবং তাঁর পবিত্র চেহারায় খুশির ছাপ প্রতিভাত হতে লাগলো।

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে দান করার মত কিছুই না থাকা সত্ত্বেও তিনি অপরের কাছ থেকে ধার করে সাহায্যপ্রার্থী লোকটিকে সাহায্য করার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু আজ আমরা ধন-সম্পদ পুঞ্জিভূত করে চলছি আর আমাদের পাশেই অনাথ-অসহায়রা ক্ষুধা-অনাহারে কষ্ট পাচ্ছে। আমরা কি পারি না মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ মহান আদর্শ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে ?

অহংকার হীনতা

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোথাও যাচ্ছেন। পথিমধ্যে একটি কবরের পাশে বসে একটি মহিলা কাঁদছে। দয়ার নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মনে ব্যথা লাগলো। তিনি এগিয়ে গেলেন ক্রন্দনরতা মহিলার কাছে। অত্যন্ত নম্র কণ্ঠে তিনি মহিলাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আল্লাহর বান্দী! তুমি অধৈর্য্য না হয়ে ধৈর্য্য ধারণ কর।

মহিলা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চিনতো না বিধায় সে একজন সাধারণ লোক মনে করে তাঁকে বললো, যাও! এখান থেকে। আমার মনের অবস্থা যে কি তা তুমি কি করে বুঝবে ? প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আর কথা বললেন না। তিনি চুপ করে তথা হতে প্রস্থান করলেন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চলে যাওয়ার পর

লোকেরা ঐ মহিলাকে বললো, তুমি কি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চিনতে পারনি ? এতক্ষণ তুমি যার সাথে কথা বলছিলে তিনিইতো আল্লাহ পাকের প্রিয় রাসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম । তুমি তাঁর সাথে এমন করে কথা বললে কেন ?

এ কথা শুনামাত্র মহিলা অস্থির হয়ে উঠলো। তৎক্ষণাত সে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে ছুটে গিয়ে হযরতের খিদমতে আরয করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! আমি আপনাকে চিনতে পারিনি, তাই আপনার সাথে আমি গোস্তাখী করে ফেলেছি। আমাকে ক্ষমা করে দিন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহিলার কথার সরাসরি কোন জবাব না দিয়ে বললেন "বিপদ ও মুসীবতের শুরু অবস্থায় যে ধৈর্যধারণ করা হয়, তাই মূলতঃ প্রকৃত সবর ও ধৈর্য্য।

এভাবে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পূর্ণ নিরহংকার ও সাদাদিধা জীবন যাপন করেছেন। কখনো আত্মগরিমা বা অহংকার প্রকাশ করেননি।

ওয়াদা পালন

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্মের পূর্বেই তাঁর পিতা ইহ জগৎ ত্যাগ করেন আর জন্মের পর শৈশবে তিনি তার স্নেহময়ী মাতাকে হারান। অতঃপর প্রথমে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দাদা আবদুল মুত্তালিব তাঁকে লালন পালন করেন। এরপর আবদুল মুত্তালিবেরও ইন্তিকাল হয়ে যায়। তখন হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চাচা আবু তালিব নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লালন পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

আবু তালিব ছিলেন একজন নামজাদা ব্যবসায়ী। শিশু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছুটা বড় হলে আবু তালিব তাঁকেও সিরিয়ার কাফেলাসহ বেশ কয়েকটি ব্যবসায়ী কাফেলার দায়িত্ব দিয়ে আশে পাশে পাঠাতে থাকেন। এবং তাতে অত্যন্ত সন্তোষজনক লাভ হয়। লোকেরাও

তার সততার অনুষ্ঠ স্বীকৃতি দিতে থাকে। এবং তাকে সাদিক (সত্যবাদী) আমীন (বিশ্বস্ত) উপাধিতে ভূষিত করে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবিল খামসা (রাযি.) বর্ণনা করেন, আমি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুওওত প্রাপ্তির পূর্বে যখন তার বয়স পয়ত্রিশ বৎসর তখন তার সাথে কিছু ক্রয়-বিক্রয় করি। কিন্তু কথা পুরোপুরি চূড়ান্ত হওয়ার পূর্বেই আমি একটি বিশেষ প্রয়োজনে কোথাও ক্ষণিকের জন্য চলে যাই। যাওয়ার সময় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে গেলাম, আপনি এখানেই অপেক্ষা করুন– আমি অল্প সময়ের মধ্যেই ফিরে আসছি। তখন আমরা আমাদের বাকী কথা চূড়ান্ত করে নিব। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ঠিক আছে। এরপর আমি চলে গেলাম।

এখান থেকে যাওয়ার পর ঘটনাক্রমে আমি এ বিষয়টি সম্পূর্ণ ভুলে গেলাম। ফলে আমার আর সেখানে ফিরে আসা হলো না। এভাবে একটানা দু'দিন কেটে গেলো। তৃতীয় দিন আমি ঐ পথে কোথাও যাওয়ার সময় দেখলাম প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানেই দাড়িয়ে আছেন। এ অবস্থা দেখে আমি একদম হতভম্ব হয়ে গেলাম আমার বাকশক্তি যেন রুদ্ধ হয়ে গেল। হঠাৎ আমি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কি বলবো ভেবে পাচ্ছিলাম না। আমি ভেবেছিলাম, তিনি আমাকে এজন্য আচ্ছা মত ধোলাই করবেন। কারণ আমার সাথে ওয়াদার কারণে একটানা তিন দিন তিনি এখানে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি আসবো বলে কথা দিয়েও আসিনি।

কিন্তু দয়ার সাগর, ক্ষমার আদর্শ, উত্তম চরিত্র মাধুরীর মূর্ত প্রতীক নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদুল্লাহ (রাযি.)কে দেখে তেমন কিছুই বললেন না, কোন রাগ বা গোস্বাও প্রকাশ করলেন না। শুধু শান্ত কণ্ঠে তাকে বললেন, ‘‘তুমি আমাকে বেশ কষ্টের মধ্যে ফেলে দিয়েছো। তুমি যাওয়ার পর থেকে শুরু করে এ সময় পর্যন্ত আমি তোমার অপেক্ষায় এখানেই দাড়িয়ে আছি।”

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকটিকে তার আসার আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন বলে কথা দিয়েছিলেন, সে কথা রক্ষা করার জন্য একটানা তিনদিন তিনি সেখানে

দাঁড়িয়ে থাকলেন। ওয়াদা পালনের এহেন নযীর ইতিহাসের পাতায় দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া যাবে কি ?

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ শিক্ষার আলোকে আমরা কি আমাদের জীবন গড়ে তুলতে পারি না ? আমরা কি পারি না মিথ্যা, ধোঁকা, প্রতারণা পরিহার করে আমাদের ওয়াদার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করতে ? হ্যাঁ পারি, নিশ্চয়ই পারি, মহান আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন।

মুর্খ্যের শিক্ষা

একজন গ্রাম্য মূর্খ্য লোক এলো প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে। সে কিছু চাইলো নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে। তিনি লোকটির চাহিদা অনুযায়ী তাকে দিয়ে দিলেন। এরপর লোকটির কাছে জানতে চাইলেন আমি তোমার সাথে উত্তম আচরণ করতে পেরেছি কি না ? গ্রাম্য লোকটি ছিলো নিতান্তই অকৃতজ্ঞ। সে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এহেন উদার বদান্যতাকে কোনরূপ মূল্যায়ন না করে জবাব দিলো, উত্তম আচরণ তো অনেক দূরের কথা আপনি মধ্যম দরজার আচরণও করেননি।

বৃদ্ধ লোকটির এহেন বেয়াদব সুলভ কথা শুনে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছুই না বলে চুপ করে রইলেন। কিন্তু সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.) লোকটির এ অভদ্র কথায় ক্ষেপে গেলেন। তাঁরা তাকে এ বেয়াদবীর শাস্তি দেয়ার জন্য প্রস্তুতি নিলেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ অবস্থা লক্ষ্য করে হাতের ইশারায় তাদেরকে থামতে বললেন। অতঃপর তিনি পুনরায় ঘরে প্রবেশ করলেন এবং ঐ গ্রাম্য লোকটিকে ডেকে আরো কিছু দান করলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, কি ভাই! এখন কি আমি তোমার সাথে উত্তম আচরণ করেছি ? মূর্খ্য লোকটি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ধৈর্য্যের ধরণ এবং বিস্ময়কর ব্যবহার দেখে হতভম্ব হলো। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আশ্চর্য আখলাক এবং অসাধারণ বদান্যতা দেখে লোকটির অন্তর চক্ষু খুলে গেলো। এতক্ষণে সে নবী আদর্শের বিমুহিত চিত্র দর্শন করতে সক্ষম হলো। আঁচ করতে পারলো সে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অলৌকিক চরিত্র মাধুরীর যথার্থতা। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রশ্নের জবাবে লোকটি এবার বললো, নিঃসন্দেহে আপনি আমার সাথে উত্তম আচরণ করেছেন। মহান আল্লাহ আপনাকে আমার প্রতি এবং আমার পুত্র-পরিজনের প্রতি এ অনুগ্রহও সহযোগিতা প্রদর্শনের জন্য উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন।

এবার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত শান্তকণ্ঠে মায়াবী ভাষায় বললেন, ইতিপূর্বে তুমি যে কথা বলেছো তাতো তুমিও জান এবং তুমি একথাও জানো যে, তোমার কথায় আমার সাহাবাদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে, তারা তোমার সে কথায় ব্যথিত হয়েছে। তুমি যদি কিছু মনে না কর এবং বিষয়টিকে অপসন্দ না কর তবে এখন তুমি যে কথা আমাকে একা একা বললে এ কথাটি সকলের সামনে পুনরায় একবার বলে দাও। যাতে তোমার পূর্বের কথার কারণে তাদের মনে যে, ব্যথা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে তা দুরিভূত হয়ে যেতে পারে। লোকটি সন্তুষ্টচিত্তে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ কথায় সম্মত হলো।

পরের দিন বিকালে যখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরের বাইরে এলেন, তখন তিনি সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) কে লক্ষ্য করে বললেন, এ গ্রাম্য লোকটির গতকালের কথা সম্পর্কে আপনারা অবগত আছেন। এরপর আমি তাকে আরো কিছু সামগ্রী দান করেছি ফলে সে আমার উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেছে। অতঃপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ লোকটির দিকে ইশারা করে শান্ত কণ্ঠে বললেন, আমি যা বলেছি সে কথা ঠিক কি না ? লোকটি জবাব দিলো, নিঃসন্দেহে আপনার কথা ঠিক। আপনি আমার প্রতি উত্তম আচরণ করেছেন। আমার প্রতি এবং আমার পুত্র-পরিজনের প্রতি এহেন অনুগ্রহের জন্য মহান আল্লাহ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

অতঃপর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপস্থিত সাহাবায়ে কিরামকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমার এবং ঐ গ্রাম্য লোকটির দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কোন ব্যক্তির একটি উট রশি ছিড়ে দৌড়ে ছুটলো, লোকেরা সকলে মিলে তার পিছু ধাওয়া করলে উটটি ভয়ে আরো দ্রুত ধেয়ে পালাতে চেষ্টা করলো। অতঃপর উটের মালিক লোকটি চিৎকার মেরে সকলকে বললো, আপনারা আমার উটটিকে ধাওয়া করবেন না, বরং

আমার উটের ব্যাপারটি আমার উপরই ছেড়ে দিন। উটটি কিভাবে ধরতে হবে সে ব্যাপারে আমিই আপনাদের চাইতে ভাল জানি। কারণ এটি দীর্ঘদিন লালন পালন করে এর মেজায সম্পর্কে আমিই অবগতি লাভ করেছি। একথা শুনে সকলেই উটটি ধাওয়া করা থেকে বিরত থাকলো।

এবার উটের মালিক কিছু ঘাস হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে উটটির দিকে অগ্রসর হতে লাগলো, উটটি ঘাসের দিকে এগিয়ে এলো। তখন মালিক উটটি ধরে নিলো এবং সেটি আবার স্বাভাবিক হয়ে গেলো। মালিক উটের পিঠে হাওদা বসিয়ে নিলো এবং সে তাতে চড়ে বসলো।

অতঃপর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, শেষ পর্যন্ত ঐ গ্রাম্য লোকটি প্রকৃত কথাটি স্বীকার করে নিয়েছে, যা তোমরাও শুনতে পেয়েছো। যদি আমি তোমাদেরকে বারণ না করতাম। বরং তোমাদের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিতাম তবে তোমরা তাকে ধ্বংস করে দিতে লোকটিও জাহান্নামে যেতো।

ক্ষেত্র বুঝে কাজ

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সহসা রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতেন না। খুব বেশী রাগের ভাব সৃষ্টি হলে তিনি বার বার দাড়ি মুবারকে হাত বুলাতেন। এটাই ছিলো হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রাগ বুঝার উপায়। কঠিন গোস্বার মুহূর্তেও তিনি কাউকে এমন কোন কথা বলতেন না, যা তার জন্য কষ্টের কারণ হতে পারে। এ ধরণের ক্ষেত্রে বরং প্রিয় নবী চুপ করে থাকতেন।

এক বারের কথা–

একজন লোক এলো প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে। গায়ে তার জাফরানে রংগানো একটি কাপড়। এ অবস্থা দেখে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মনে খুব গোস্বার সৃষ্টি হলো। তা সত্ত্বেও তিনি তাকে কিছুই বললেন না। কারণ এত লোকের মাঝে তাকে কিছু বললে সে হয়তো লজ্জিত হতে পারে। এছাড়া গোস্বার মুহূর্তে লোকটিকে কিছু বলতে গেলে হয়তো কোন কড়া কথাও এসে যেতে পারে। লোকটি চলে যাওয়ার পর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম অন্যদের বলে দিলেন, তোমরা তাকে কৌশলে বলে দিও! সে যেনো আর কখনো এমন কাপড় ব্যবহার না করে।

যেখানে মানুষের স্বাভাবিক অভ্যাস হলো কাউকে কিছু বলার সুযোগ পেলে কেউ সে সুযোগ হাতছাড়া করতে চায় না। কিন্তু উত্তম আদর্শের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নমূনা প্রিয়নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ক্ষেত্রে কত সুন্দর পদ্ধতি অবলম্বন করলেন যাতে লোকটিকে লজ্জিতও হতে না হয় আবার তার ত্রুটির ও সংশোধন হয়ে যায়। আর এ কারণেই তো বলা যায় "সকল গুনের আধার তিনি"।

অনুকম্পা প্রদর্শন

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে নববীতে বসে আছেন। সাথে রয়েছেন সাহাবায়ে কিরামের (রাযি.) এক জামা'আত। একটি লোক মসজিদে প্রবেশ করলো। লোকটি গ্রাম্য মূর্খ্য মসজিদের পবিত্রতা সম্পর্কে তার কিছুই জানা নেই। তার পেশাবের প্রয়োজন দেখা দিলে মসজিদের মধ্যে দাঁড়িয়েই সে পেশাব করতে শুরু করলো।

এ অবস্থা দেখে সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.) আশ পাশ থেকে তেড়ে গিয়ে তাকে ধরতে চাইলেন। কিন্তু প্রিয় নবী, করুণার ছবি হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বারণ করে বললেন, একে পেশাব করতে দাও!

পেশাব শেষে সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.) তাকে প্রহার করে এ অন্যায়ের শাস্তি দিতে চাইলে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবারও বারণ করলেন। তিনি লোকটিকে ডেকে সুন্দরভাবে, শান্ত কণ্ঠে মসজিদের পবিত্রতা সম্পর্কে বুঝিয়ে দিয়ে বললেন, এটি পেশাব করার জায়গা নয় বরং এটি হলো মহান আল্লাহ পাকের ইবাদত বন্দেগী করার জায়গা। এটি অত্যন্ত পবিত্র স্থান মসজিদ। এখানে পেশাব কারা যায় না।

অতঃপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.) কে হুকুম করলেন। তোমরা এক বালতি পানি এনে এ স্থানটি ধুয়ে পরিষ্কার করে দাও। মহান আল্লাহ আমাদেরকে মানুষের প্রতি

কঠোরতা প্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করেননি বরং নম্র ও সহজ আচরণের জন্যই প্রেরণ করেছেন।

একদম নিজস্ব পরিবেশে, অপরাধীকে শাস্তি দেয়ার সম্পূর্ণ ক্ষমতা ও শক্তি থাকার পরও এ ধরনের অপরাধীকে এভাবে ক্ষমা প্রদর্শন করে তার প্রতি এহেন অনুকম্পা প্রদর্শনের দুর্লভ নযীর স্থাপন শুধু উত্তম আদর্শের মূর্তপ্রতিক প্রিয়নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দ্বারাই সম্ভব। ওহে মানবমণ্ডলী! শিক্ষাগ্রহণ কর।

সঠিক পন্থা নিরূপন

সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.) ছিলেন প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রেমানলের পতেঙ্গা তুল্য। দেশ বিদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে পঙ্গপালের ন্যায় ছুটে এসে যারা জড়ো হয়েছিলেন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে।

একদিনের কথা–

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অযূ করছেন। সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.) তাঁর চারপাশে জড়ো হয়ে দণ্ডায়মান। তাঁরা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অংগ নিঃসৃত পানি হাতে নিয়ে নিজেদের গায়ে মুছে দিচ্ছেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা এরূপ করছো কেন ? সকলে জবাব দিলেন, মহান আল্লাহ ও তদ্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি মুহাব্বতের কারণে। এর প্রেক্ষিতে প্রিয় নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, যদি কেউ মহান আল্লাহ ও তার প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি মহব্বত করার আনন্দ লাভ করতে চায় তবে তার পদ্ধতি হবে– সে ব্যক্তি কথা বলার সময় যেনো সত্য কথা বলে এবং যথার্থ ভাবে আমানতদারী বজার রাখে আর প্রতিবেশীর সাথে উত্তম আচরণ করে।

এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয় বিষয় হচ্ছে, সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.) নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি অগাধ ভক্তি শ্রদ্ধার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অংগ নিঃসৃত পানি নিজেদের গায়ে মুছে দিচ্ছিলেন। যা ছিলো তাঁর প্রতি সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.)-এর চুড়ান্ত ভালবাসার নিদর্শন। কিন্তু প্রিয় নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন অনিয়মতান্ত্রিক ভক্তি শ্রদ্ধার বহিঃপ্রকাশ মেনে নিতে রাযী নন। বিধায় তিনি তাদেরকে অত্যন্ত হিকমতের সাথে এ পদ্ধতি পরিহার করে সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করার পন্থা বাতলে দিলেন।

এজন্য আমাদের উচিৎ কারো প্রতি আন্তরিকতা ও ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে গিয়ে যাতে এমন কোন পথ ও পন্থা গ্রহণ না করি, যা শুধু আবেগ উচ্ছাসের বহিঃপ্রকাশ-নিস্ফল আচরণ মাত্র। যার ফলে শুধু অতি ভক্তিই প্রকাশ পায় এ ছাড়া কোন সার্থক ফলাফল সেখানে লাভ করা যায় না।

ঝগড়ার হৃদ্যতা

প্রিয় রাসূল হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মাহাতুল মুমিনীনগণের প্রতি অত্যন্ত স্নেহ ও মহব্বতের আচরণ করতেন। কখনো মহব্বতের কারণেই সামান্য গোস্বারও বহিঃপ্রকাশ ঘটতো। এমনি একদিনের কথা–

হযরত আইশা সিদ্দীকা (রাযি.) বলেন, আমার মধ্যে এবং রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মধ্যে একবার কোন এক ব্যাপারে মতের কিছুটা ভিন্নতা দেখা দিলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, এজন্য কোন একজনকে সালিস নিয়োগ করা হোক, যে আমাদের মাঝে বিষয়টি মিমাংসা করে দিবে। অতঃপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমে হযরত আবু উবাইদা (রাযি.)-এর নাম প্রস্তাব করলে আমি তাকে অধিক নরম বলে প্রত্যাখ্যান করলাম। এরপর তিনি হযরত উমর (রাযি.)-এর নাম উল্লেখ করলে আমি তাকে অত্যন্ত রাগী মানুষ বলে উপেক্ষা করলাম। শেষ পর্যায়ে তিনি আমার আব্বা হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর নাম প্রস্তাব করলে আমি তাতে সম্মত হলাম।

এরপর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংবাদ দিয়ে হযরত আবু বকর (রাযি.) কে হাযির করলেন এবং বললেন, আপনি আমাদের উভয়ের মাঝে মধ্যস্থতা করুন। হযরত আইশা (রাযি.) বলেন, এরই মাঝে আমি বলে উঠলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! আমার প্রতি যেন ইনসাফ করা হয়।

আমার একথা শুনেই আমার আব্বা হযরত আবু বকর (রাযি.) খুব রেগে গেলেন এবং বললেন, আল্লাহর নবী সম্পর্কে তোমার এহেন মন্তব্য! এই বলে তিনি আমাকে সজোরে এক চপেটাঘাত করলেন। যার কারণে আমার নাক দিয়ে রক্ত বেরিয়ে পড়লো।

এ অবস্থা দেখে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব ব্যথা পেলেন। তিনি হযরত আবু বকর (রাযি.) কে লক্ষ্য করে বললেন, আমরা আপনাকে শুধু মধ্যস্থতা করার জন্যই ডেকেছি, কাউকে প্রহার করার জন্য নয়। এ বলে তিনি দ্রুত তাঁর পবিত্র চাদর দ্বারা আমার নাকে-মুখের রক্ত মুছে পরিষ্কার করে দিলেন।

আহ! কত মায়াময় সে দৃশ্য, কত স্নেহ ও মাধুরতাপূর্ণ পরিবেশ। নিজ স্ত্রীর প্রতি রাগের মুহূর্তেও এহেন আচরণ করতে হলে কতটা উদার ও আদর্শবান হতে হয় সেটাই এখানে ভাববার বিষয়।

সহনশীলতা

সাফা পর্বতের পাদদেশে ধ্যানমগ্ন বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। ধূর্ত আবু জাহল যাচ্ছিলো সে পথ ধরে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখে গা জ্বলে উঠলো তার। সে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি বিভিন্ন কটুবাক্য ব্যায় করে চললো। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাতে অনেক চেষ্টা করেও সে ব্যর্থ হলো। আবু জাহলের শত কটুক্তি সত্ত্বেও প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন জবাব না দিয়ে সম্পূর্ণ নিঃশ্চুপ রইলেন।

কোন ভাবেই কিছু করতে না পেরে পাশণ্ড আবু জাহল প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিস্পাপ ও নিস্কলঙ্ক মুবারক বদনে এক টুকরা পাথর ছুঁড়ে মারলো। পাথর খন্ডটি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র মাথায় আঘাত হানলো আর অমনি ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোতে লাগলো। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন অত্যন্ত ত্যাগী। তিনি ছিলেন ধৈর্য্যের পর্বত। তিনি সবই নিরবে সয়ে গেলেন। এব্যাপারে তিনি কাউকেই কিছু বললেন না। অপরদিকে এ পুরো ঘটনাটিই দূর থেকে এক মহিলা প্রত্যক্ষ করলো। সে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চাচা হযরত হামযা (রাযি.) বাড়িতে এলে তাঁর কাছে সব বলে দিলো। (উল্লেখ্য যে, হযরত হামযা (রাযি.) তখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি।) নিজ ভাতিজার উপর এহেন অন্যায় আচরণ সহ্য করতে না পেরে তখনই তিনি আবু জাহলের খোঁজে বেরোলেন। আজ তিনি এ অন্যায় আচরণের প্রতিশোধ নিয়েই তবে ক্ষ্যান্ত হবেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি আবু জাহলকে পেয়ে গেলেন। আর অমনি তার মাথায় আঘাত করে জখম করলেন এবং রক্ত বের করে দিলেন। এভাবে তাকে তিনি বেদম প্রহার করলেন। এরপর হযরত হামযা (রাযি.) প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসে বললেন, ভাতিজা! এক্ষণে আমি আবু জাহলের মাথা যখম করে রক্ত বের করে দিয়ে তোমার প্রতি তার অন্যায় আচরণের প্রতিশোধ নিয়ে এলাম।

কিন্তু ত্যাগ ও ধৈর্য্যের মহিমায় ভাস্বর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্নিগ্ধ কণ্ঠে জবাব দিলেন, চাচাজান! এ জাতীয় সংবাদ আমার জন্য কোন আনন্দের বিষয় নয়। এতে আমি সামান্যও আনন্দ পাইনি। তবে আমি যদি আপনার মুখে আপনার ইসলাম গ্রহণের কথা শুনতাম তবে তা আমার জন্য মহা আনন্দের বিষয় হতো।

বিবেকবানদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একথা ভেবে দেখা উচিৎ। কতটুকু ত্যাগী এবং ধৈর্য্যশীল হলে এহেন অন্যায় আচরণ নীরবে সহ্য করে নেয়া যায় ? প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কেমন সহ্য শক্তি থাকলে প্রতিশোধ গ্রহণে সম্পূর্ণ নিরুদ্যোগী থাকা যায় ? শুধু কি তাই ? প্রতিশোধ নেয়া হয়েছে শুনেও কতটুকু দরদী হলে এ মন্তব্য করা যায় যে, এতে আমার জন্য খুশির কিছুই নেই ?

এটাই হচ্ছে আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উন্নত স্বভাব। এইতো আকায়ে নামদার, তাজদারে মদীনা হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মোহনীয় আখলাক।

অবশ্য নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সে কথা শুনে তাৎক্ষণিক ভাবে হযরত হামযা (রাযি.) ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সকলকে তার ইসলাম গ্রহণের কথা জানিয়ে দেন। তার ইসলাম গ্রহণের পরেই অমুসলিম শক্তিগুলো ইসলামের একটি সতন্ত্র প্রভাব ও শক্তি আঁচ করতে পেরেছিলো।

নম্রতা

ইয়াহুদী সম্প্রদায় এবং তাদের দোষররা আজীবন বেয়াদব। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মত একজন নম্র ও পবিত্র মানবাত্মার সাথেও ওরা হাজারো রকমের বেয়াদবী মূলক আচরণ করেছে। আর সে সব ক্ষেত্রেও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত নম্র ও ভদ্র আচরণ প্রদর্শন করেছেন। ধৈর্য্য ও আদর্শের স্বাক্ষর রেখেছেন।

এক দিনের কথা-

এক ইয়াহুদী দুরাচার এলো প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে। এসেই সে সালাম না দিয়ে বললো, "আস্‌সামু আলাইকুম" যার অর্থ তোমার মৃত্যু হোক। আম্মাজান হযরত আইশা সিদ্দীকা (রাযি.) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ইয়াহুদীর এহেন বেয়াদবী সহ্য করতে না পেরে তার জবাবে বললেন, তোমাদেরই মৃত্যু হোক এবং তোমাদের উপর অভিশাপ বর্ষিত হোক।

হযরত আইশা সিদ্দীকা (রাযি.)-এর এ উক্তি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পসন্দ করলেন না। তিনি বললেন, হে আইশা! মহান আল্লাহ অত্যন্ত দয়ালু এবং সকল ক্ষেত্রেই তিনি দয়ার আচরণ করা পসন্দ করেন।

হযরত আইশা সিদ্দীকা (রাযি.) বলেন, আমি তখন আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! এ ইয়াহুদী আপনার প্রতি কি উক্তি করেছে আপনি কি তা শুনতে পাননি ? হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন, আমি তার সে উক্তি শুনিনি তা নয়। আমি তার চালাকীর জবাবে শুধু "ওয়া আলাইকা" বলে দিয়েছি, যার অর্থ তোমারও মৃত্যু আসবে।

এখানে লক্ষ্যনীয় বিষয় হচ্ছে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সব জেনে শুনেও ইয়াহুদীর প্রতি কোন কঠোর আচরণ করলেন না, বরং তখনো তিনি অত্যন্ত বিনয়ী ও নম্রতা সুলভ ব্যবহার করে গেলেন। আম্মাজান হযরত আইশা সিদ্দীকা (রাযি.) কিছু বললেন বটে, কিন্তু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা পসন্দ করলেন না।

এটাই ছিলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদর্শ আর এই ছিলো নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নম্রতার একটি ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত।

সাম্য নীতি

ইসলাম সাম্যের ধর্ম। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সাম্যের মূর্ত প্রতীক। আর একারণে তাঁর চরম দুশমনরাও ন্যায় বিচার পাওয়ার আশায় তাঁর দরবারে মুকাদ্দমা নিয়ে হাযির হতো। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আপন-পর শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সকলের প্রতি ইনসাফ ও সাম্য নীতি প্রদর্শন করতেন। এক্ষেত্রে সাধারণ-বিশেষের পার্থক্য তিনি করতেন না। এমনি একটি টুকরো কাহিনী-

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আনাস (রাযি.)-এর ঘরে বসে আছেন। তার বাম পাশে বসে আছেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.)। হযরত উমর (রাযি.) বসা ছিলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সামনে। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ডান পার্শে বসে আছে একজন গ্রাম্য সাধারণ লোক। এ অবস্থায় রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আনাস (রাযি.)-এর কাছে একটু পানি চাইলেন। হযরত আনাস (রাযি.) তাঁকে কিছু দুধ এনে দিলেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে প্রথমে সে পাত্র থেকে কিছু দুধ পান করলেন। এরপর হযরত উমর (রাযি.) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.) কে বাকী দুধ পান করতে দেয়ার জন্য ইশারা করলেন। কারণ তাঁদের ধারণা ছিলো যে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পান করার পর যে দুধ টুকু বাকী থাকবে তা প্রথমে তিনি হয়ত হযরত আবু বকর (রাযি.) কিংবা হযরত উমর (রাযি.) কেই দিবেন, যেহেতু এ মজলিসে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পরে তাঁরা দু'জনই অধিক মর্যাদাবান ব্যক্তিত্ব। আর সে জন্য হযরত উমর (রাযি.) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.) এর প্রতি ইশারা করে বুঝালেন যে, তাঁকেই আগে পান করতে দিন এতে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'জনের কাউকেই

আগে পান করতে দিলেন না। বরং তিনি বললেন, যে ডান দিকে বসা থাকে তারই আগে পান করার হক। একথা বলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুধের পাত্রটি প্রথমে ঐ গ্রাম্য লোকটিকে দিলেন। সে পান করলো। এরপর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.) পান করলেন। অতঃপর হযরত উমর (রাযি.) পান করলেন।

এভাবেই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের মাঝে সাম্যনীতি প্রতিষ্ঠা করেছেন। এবং তাদেরকে তাদের যথার্থ অধিকার দান করেছেন। সাধারণ-বিশেষ নির্বিশেষে এক্ষেত্রে সকলেই ছিলো সমান। আর এরই নাম হলো ইসলাম এটাই হচ্ছে ইসলামের আদর্শ আর এ মোহনীয় ও সমতাপূর্ণ আদর্শই ইসলামকে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছে। প্রমাণ করেছে ইসলামই হলো শ্রেষ্ঠ ও একমাত্র জীবন বিধান।

কর্ম পরায়নতা

মসজিদে নববীর নির্মান কাজ চলছে। সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.) সকলেই নির্মান কাজে সাহায্য করছেন। প্রয়োজনীয় সামান-পত্র সংগ্রহ করে দিচ্ছেন। এসময় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও অকর্মন্য বসে থাকতে পসন্দ করেননি বরং তিনি নিজেও ইট বালু বহন করে কাজে যোগান দিতে লাগলেন। সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.) এ অবস্থা দেখে বিচলিত হয়ে বার বার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কাজ থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ জানালেন। কিন্তু তিনি কোন ক্রমেই কাজে সহযোগিতা করা থেকে বিরত থাকলেন না।

অন্য এক দিনের কথা-

সাহাবায়ে কিরাম (রাযি) কোথাও যাওয়ার সময় একস্থানে কাফেলার যাত্রা বিরতি করা হলো এবং সেখানে রান্না-বান্নার কাজ করার জন্য আয়োজন চলতে লাগলো। নিয়ম মাফিক সকলের মাঝে কাজ বন্টন করে দেয়া হলো এবং প্রত্যেকেই দায়িত্ব অনুযায়ী নিজ নিজ কাজ আঞ্জাম দিয়ে চললেন। কেউ পানি আনছেন, কেউ আগুন জ্বালাচ্ছেন, কেউ পাত্রসমূহ ধুয়ে প্রস্তুত করছেন। এ সময় প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লাকড়ী সংগ্রহের কঠিন কাজটি নিজের দায়িত্বে নিলেন।

সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.) অত্যন্ত বিনীত ভাবে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে অনুরোধ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! এ কাজটিও আমরাই সমাধা করবো, আপনাকে কষ্ট করতে হবে না। কিন্তু অত্যন্ত কর্মপরায়ন ও কঠিন পরিশ্রমী-কর্মঠ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন, তোমরা যা বলেছো তা তোমাদের হিসেবে ঠিকই বলেছো। কিন্তু তোমরা সকলে কাজ করবে আর আমি তোমাদের সাথে থাকা সত্ত্বেও হাতপা গুটিয়ে বসে থাকবো, এমনটি আমার মোটেও পসন্দ নয়। আর মূলতঃ এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ পাকও পসন্দ করেন না।

এভাবেই আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকলের সাথে সমান ভাবে কাজে অংশ গ্রহণ করতেন। নিজেকে বিশিষ্ট একজন ভেবে শান-শতকত নিয়ে বসে থাকা তিনি কোনদিনও পসন্দ করতেন না। অথচ মহান আল্লাহর পরেই তিনি মহান। দুনিয়া ও আখিরাতের তিনি বাদশাহ। বর্তমান সময়ের রাজা-বাদশাহ আর আমীর নেতারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ মহান আদর্শগত বিষয়টি ভেবে দেখবেন কি ?

আল্লাহর প্রতি ভরসা

ঐতিহাসিক গাতফান যুদ্ধের কথা। তথা হতে ফিরার পথে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি গাছের নিচে আরাম করছিলেন। সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.) ছিলেন খানিকটা দূরে। এ অবস্থা দেখতে পেলো কাফির নেতা দু'সূর। সে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একাকী দেখে এটাকে একটা সুযোগ মনে করলো। বিধায় সে সুযোগ হাত ছাড়া করতে চাইলো না দু'সূর।

টিপ টিপ করে গোপনে সে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে চলে এলো, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর তলোয়ারটি তখন গাছের ডালে ঝুলানো ছিলো। চটকরে দু'সূর তলোয়ারটি নিজের হাতে নিয়ে নিলো আর অমনি তা উঁচিয়ে ধরলো প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দিকে। বললো মুহাম্মদ!

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এখন আমার হাত থেকে তোমাকে কে রক্ষা করবে ?

মহান আল্লাহ যাকে শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করার ওয়াদা করেছেন তাঁর আবার কিসের ভয় ? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ অবস্থায় সামান্যতমও বিচলিত হলেন না। বরং তিনি অত্যন্ত স্থির চিত্তে জবাব দিলেন, 'আল্লাহ'। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই একটি মাত্র শব্দ দু'সূর-এর মধ্যে দারুণ ভয়ের সঞ্চার করলো। তার সমস্ত শরীর আশ্চর্য কম্পন শুরু হয়ে গেলো। সে ভয়ে এতবেশী অস্থির হয়ে পড়লো যে, কাঁপতে কাঁপতে এক পর্যায়ে তার হাত হতে তরবারীটি ছুটে নিচে পড়ে গেলো।

রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার অবস্থা প্রত্যক্ষ করছিলেন। তলোয়ারটি নিচে পড়তেই তিনি পট করে তা উঠিয়ে হাতে নিলেন। এবং দু'সূরের দিকে তা বাড়িয়ে ধরে বললেন, "বলো এবার আমার হাত থেকে তোমাকে কে রক্ষা করবে ?" দু'সূর এবার হতভম্ব হয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে শুধু তাকিয়ে রইলো, আর নিজের অসহায়ত্ব প্রকাশ করলো। ইতিমধ্যে সাহাবায়ে কিরামের (রাযি.) মাঝে খবর ছড়িয়ে পড়লে তাঁরা সেখানে ছুটে এলেন। এখনই দু'সূরের বারটা বাজাবার উপযুক্ত সময়। কিন্তু দয়ার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন ক্ষমা ও অনুগ্রহের মূর্ত প্রতীক। তিনি দু'সূরকে কিছুই বললেন না এবং তাকে কোনরূপ শাস্তিও দিলেন না বরং সম্পূর্ণ নিরাপত্তার সাথে তাকে ছেড়ে দিলেন।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ আদর্শে বিমুগ্ধ হয়ে পরবর্তীতে দু'সূর তার দলবল ও গোত্রসহ এসে ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। তিনি শামিল হয়েছিলেন স্বর্ণযুগের স্বর্ণ মানব হযরত সাহাবায়ে কিরামের (রাযি.) নূরানী কাফেলায়।

তলোয়ার আর শক্তির প্রভাবে নয় এভাবে আদর্শ ও উদারতার স্নীগ্ধ-শীতল পরশেই প্রিয়নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোটা বিশ্ব জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি মহান তিনিই অপ্রতিদ্বন্দী।

অতিথি পরায়নতা

কয়েকজন ইয়াহুদী প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে মেহমান হলো। তিনি সাহাবায়ে কিরামের (রাযি.) মাঝে দু'একজন করে মেহমান বণ্টন করে দিয়ে দিলেন। একজন ইয়াহুদী খুবই দুরাচার ছিলো বলে তাকে কেউ মেহমান হিসেবে গ্রহণ করতে চাইলো না। তাই তাকে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের ঘরে মেহমান হিসেবে নিয়ে নিলেন। স্বভাব সুলভ ভাবে তিনি অত্যন্ত যত্নের সাথে লোকটির মেহমানদারী করলেন।

খাওয়ার সময় হলে সে লোকটি একাই বেশ কয়েকজনের খানা খেয়ে সাবাড় করে দিলো। এ জাতীয় দূরভীসন্ধী পূর্ব থেকেই তার মনের মাঝে লুকায়িত ছিলো। খাওয়া-দাওয়ার পর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধ্যমত উমদা বিছানায় তাকে শুইতে দিলেন। ঐ ইয়াহুদী দুরাচারের উদ্দেশ্য পূর্ব থেকেই খারাপ ছিলো। মাত্রারিক্ত খাওয়ার কারণে তার পেটে গোলমাল দেখা দিলো, ফলে রাত্রে সে মলমূত্র দ্বারা বিছানা এবং কক্ষ নষ্ট করে সকাল হওয়ার পূর্বেই পালিয়ে গেলো।

কিন্তু মহান মাওলার মঞ্জুরী ছিলো অন্য কিছু। তিনি ঐ ইয়াহুদীকে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সংস্পর্শের সুফল ভোগ করাতে চান। সামনের ঘটনা তারই প্রমাণ–

যাওয়ার সময় ইয়াহুদী ভুল বসতঃ তার একটি মূল্যবান তরবারী প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কক্ষে ফেলে গেলো। কিছু দূর যাওয়ার পর তার তরবারীটির কথা স্মরণ হলে মূল্যবান তরবারীর মায়ায় সে পুনরায় ফিরে এলো। ফিরে আসার সময় সে যা কল্পনা করলো এবং পরে বাস্তবে যা দেখতে পেলো তাতেই ইয়াহুদীর জীবনের মোড় পরিবর্তনের সূচনা হলো।

ইয়াহুদী দেখলো প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং নিজ হস্তে সে সব মলমূত্র পরিস্কার করছেন আর বলছেন আহ! লোকটির যেন কত কষ্ট হয়েছে। অতঃপর ঐ ইয়াহুদীকে দেখার সাথে সাথে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, আহ! আমার ব্যবস্থাপনার ত্রুটির কারণে রাতে আপনার অনেক কষ্ট হয়েছে। আপনি তো আমার মেহমান ছিলেন। এ কষ্টের জন্য আমি দুঃখিত, আপনি আমাকে ক্ষমা

করে দিন। আর আপনি যাওয়ার সময় আপনার তরবারীটি রেখে চলে গেছেন। একটু দাঁড়ান আমি আপনার তরবারীটি এনে দিচ্ছি বলেই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ কক্ষ থেকে ইয়াহুদীর তরবারীটি এনে তার হাতে দিলেন।

লোকটি ভেবেছিলো, আমাকে দেখলেই মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তেলে বেগুনে জ্বলে উঠবেন। আর আমার হয়তো বারটা বাজিয়ে ছাড়বেন। সে মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলো, পরিস্থিতি খারাপ দেখলে দূর থেকেই পালিয়ে ভাগবে। কিন্তু এখানে এসে তার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণিত হলো। সে সম্পূর্ণ অদ্ভূত আচরণ প্রত্যক্ষ করলো যা ছিলো তার কল্পনারও অনেক দূরে।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ মোহনীয় আদর্শিক আচরণের প্রভাবে সে আর ইসলাম থেকে দূরে থাকতে পারলো না বরং নবী আদর্শের স্বর্ণ ছোঁয়ার সে পবিত্র ইসলাম গ্রহণের গৌরব অর্জন করলো।

তাই তো আমরা বলি "তরোয়ারে নয় উদারতায়"। অর্থাত, তরবারীর শক্তির জোরে নয় বরং গোটা বিশ্বে ইসলাম প্রসারিত হয়েছে তার উদারনীতিও মোহনীয় আদর্শের প্রভাবে।

অনাড়ম্বারতা

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবন ছিলো সম্পূর্ণ অনাড়ম্বর। তিনি সাজ সজ্জা, আরাম-আয়েশ মোটেও পসন্দ করতেন না। নিজের অনুসারী ও পরিবারের কাউকেই তা গ্রহণ করতে দিতেন না, নিজেও যথেষ্ট সাদা-সিধা, আড়ম্বরহীন জীবন যাপন করতেন।

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি মোটা কম্বলে শুয়ে রাত যাপন করতেন। আম্মাজান হযরত আইশা সিদ্দীকা (রাযি.) দুই ভাজ করে সেটি মেঝেতে বিছিয়ে দিতেন। হযরত আইশা সিদ্দীকা (রাযি.) বলেন, একদিন আমি সে চাদরটি চার ভাজ করে বিছিয়ে দিলাম। সেদিন বিছানাটি একটু মোলায়েম হলো, তাতে শুইতে একটু আরাম হলো। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরাম প্রিয় ছিলেন না। তিনি

সকালে ঘুম থেকে উঠেই হযরত আইশা সিদ্দীকা (রাযি.) কে জিজ্ঞাসা করলেন, আজ আমার বিছানাটি কিভাবে বিছানো হয়েছিলো ? হযরত আইশা সিদ্দীকা (রাযি.) জবাব দিলেন, এটি আজ চার ভাজ করে বিছিয়ে ছিলাম যাতে আপনার শুইতে একটু আরাম হয়। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এভাবে বিছানোর প্রয়োজন নেই বরং পূর্বের ন্যায় দুইভাজ করেই চাদরটি বিছিয়ে দাও। কারণ গতরাতে বেশী আরামের কারণে আমার ইবাদতে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছে।

অন্য এক দিনের কথা-

প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন এক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। হযরত ফাতিমা (রাযি.) এ খবর শুনে প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সম্মানার্থে ঘরের দরজায় একটি সুন্দর পর্দা ঝুলিয়ে দিলেন, এবং হযরত হাসান (রাযি.) হুসাইন (রাযি.) দ্বয়কে রূপার কংকন পরিয়ে সাজালেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে তাৎক্ষনিক ভাবে তথা হতে প্রস্থান করলেন।

হযরত আইশা সিদ্দীকা (রাযি.) প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অসন্তুষ্টির কারণ বুঝতে পেরে সাথে সাথে পর্দাটি ছিঁড়ে ফেললেন এবং হযরত হাসান (রাযি.) ও হযরত হুসাইন (রাযি.) দ্বয়ের হাত থেকে কংকন খুলে ফেললেন। হযরত হাসান ও হযরত হুসাইন (রাযি.) কংকন খুলে নেয়ার কারণে কাঁদতে কাঁদতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে হাযির হলেন। তখন তিনি ইরশাদ করলেন, এরা আমার পরিবারের সদস্য আমি চাই না যে, এরা পার্থিব কোন সাঁজ সজ্জায় জড়িয়ে পড়ুক।

এভাবেই হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে এবং তাঁর অধিনস্তদের পার্থিব সাজসজ্জা থেকে বিরত রেখে অনাড়ম্বর জীবন যাপন অবলম্বন করেছেন।

আড়ম্বরপূর্ণ ও বিলাসী জীবন যাপনে অভ্যস্ত প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রিয় উম্মতেরা বিষয়টি ভেবে দেখবেন কি?

দু'আ কবুল

সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) ইসলাম গ্রহণ করেছেন অনেক আগেই, কিন্তু তাঁর আম্মা এখনো অমুসলিম। হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে যাতায়াত করেন এটা তিনি পসন্দ করেন না। যখনই তিনি বাড়ী আসেন, তাঁর মা তাঁকে বকাবকি করেন, প্রহার করেন।

হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) প্রতি নিয়তই তাঁর মাকে ইসলাম সম্পর্কে বুঝাতে চেষ্টা করেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাহাত্ম্য সম্পর্কে বুঝিয়ে ইসলামের দাওয়াত দেন। কিন্তু তাঁর মা বরাবরই তা প্রত্যাখ্যান করতে থাকেন।

একবার খুব ভাল ভাবে হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) তাঁর মাকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান তো করলেনই, সাথে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কেও একটি বেয়াদবীপূর্ণ কটুক্তি করে বসলেন। এতে হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) খুবই ব্যথিত হলেন এবং তিনি মনের ব্যথায় কাঁদতে কাঁদতে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে এসে সব খুলে বললেন। এবং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খিদমতে তাঁর মাতার ইসলাম নসীব হওয়ার জন্য দু'আর আবেদন জানালেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.)-এর মাতার ইসলাম নসীব হওয়ার জন্য মহান আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করলেন "ইয়া আল্লাহ! আবু হুরাইরা (রাযি.)-এর আম্মাকে তুমি ইসলাম গ্রহণ করার তাওফীক দান কর এবং তাকে সঠিক হিদায়াত দাও"।

এ দু'আর পর হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.)-এর মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি হলো যে, নিঃসন্দেহে এ দু'আ কবুল হয়ে গেছে। তাই তিনি খুব দ্রুত নিজের বাড়ীতে রওয়ানা করলেন। মনে মনে ভাবলেন আজ আমি দেখবো, আমি বাড়ীতে আগে পৌঁছুতে পারি, নাকি আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দু'আ আগে পৌঁছে যায়। এই ভেবে তিনি খুব দ্রুত গতিতে বাড়ী গেলেন।

বাড়ী পৌঁছে তিনি দেখলেন, ঘরের দরজা বন্ধ। ভিতরে তার আম্মার গোসলের শব্দ শোনা যাচ্ছে। তখন তিনি ভাবলেন, আল্লাহর নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দু'আই হয়তো আমার আগে বাড়ীতে পৌঁছে গেছে, আম্মাজান ইসলাম গ্রহণের জন্যই হয়তো গোসল করছেন। হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.)-এর ধারণা সঠিক ছিলো। গোসল সেরে তাঁর আম্মা ঘরের দরজা খুললেন এবং তৎক্ষণাৎ হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.)-এর সামনে তিনি পড়ে নিলেন "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" এভাবে ইসলামের কালেমা পাঠ করে তিনি মুসলমান হয়ে গেলেন।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমনি ভাবে যখনই কোন বিষয়ে মহান মাওলার শাহী দরবারে হাত তুলে ফরিয়াদ করতেন, তখন মহান আল্লাহ সাথে সাথে তার প্রিয় বান্দা হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ফরিয়াদ কবুল করে নিতেন।

অসুস্থের খোঁজ-খবর

প্রিয়নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাজারো উন্নত ও আদর্শপূর্ণ গুণাবলীর মাঝে অসুস্থের খোঁজখবর নেয়া ছিল একটি বিশেষ গুন। নিজের আত্মীয়স্বজন তো বটেই কোন সাধারণ মুসলমানের অসুস্থ হওয়ার খবর পেলেও তিনি ছুটে যেতেন তার কাছে তার খোঁজখবর নিতেন, তাকে সাহস স্মিত যোগাতেন তার জন্য দু'আ করতেন। সুধু মুসলমান কেন দয়ার নবী কোন অমুসলিম প্রতিবেশী অসুস্থ হলে তারও খোঁজখবর নিতে ভুলেননি কখনো।

একবার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত সা'দ ইবনে উবাদা (রাযি.)-এর অসুস্থতার সংবাদ শুনতে পেলেন। সাথে সাথে তিনি তাঁকে দেখার জন্য তাঁর বাড়ীতে যান। অসুস্থ হযরত সা'দ (রাযি.)কে দেখেই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অন্তর ব্যদনায় ভরে উঠে। ধৈর্য্যের পর্বত স্বয়ং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এহেন বিচলিত ভাব লক্ষ্য করে ঘরের অন্যান্য লোকেরা ক্রন্দন করতে শুরু করলো।

অন্য একদিনের কথা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত জাবির (রাযি.)-এর অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে তাকে দেখতে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন। হযরত জাবির (রাযি.)-এর বাড়ী ছিলো বেশ দূরে, তা সত্ত্বেও প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে দীর্ঘ পথ

অতিক্রম করে নিয়মিত তার বাড়ীতে গিয়ে তার খোঁজ-খবর নিতে থাকেন। রোগের আধিক্য হেতু তিনি মাঝে মাঝেই বেহুশ হয়ে পড়তেন, তখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর চেহারায় নিজের অযূর উদ্বৃত্ত পানি ছিটিয়ে দিতেন, এতে তিনি আবার হুশ ফিরে পেতেন।

এভাবেই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কারো অসুস্থ্য হওয়ার খবর পেলে তার কাছে ছুটে যেতেন, তার খোঁজখবর নিতেন আমরাও কি পারি না প্রিয়নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ প্রিয় সুন্নাতটির উপর আমল করে আমাদের জীবন ধন্য করতে?

আকর্ষণ

ইয়ামানের বিখ্যাত জাদুকর, নাম তার ''যেমাদ"। জাদুবিদ্যায় তার ছিলো অসাধারণ অহংকার। সে একবার মক্কায় এসে কুরাইশ সরদারের কাছে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব আর গুণ কীর্তন আলোচনা করে বললো, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর ভূত সওয়ার হয়েছে যার কারণে সে বাপ-দাদার ধর্ম বাদ দিয়ে আবোল-তাবোল বকতে শুরু করেছে। আমি তার উপর থেকে দুষ্ট ভূতের প্রভাব দূর করে দিতে পারি। যেমাদের একথা শুনে কুরাইশ সরদাররা বেশ খুশি হলো, কারণ তাদেরও ধারণা যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর আসলেই ভূতের আছর হয়েছে। আর তার প্রভাবেই তিনি মানুষকে বিমুহিত করে ফেলেন।

অবশেষে কুরাইশ সরদাররা সকলে যেমাদকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর থেকে ভূত তাড়ানোর কথা বললো, কথা মত যেমাদও হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর থেকে ভূত তাড়ানোর খাহেশ প্রকাশ করলো। সে মতে যেমাদ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললো, আপনার উপর ভূত সওয়ার হয়েছে। আমি সে ভূত তাড়াতে এসেছি।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃদু হেসে বললেন, ভূত তাড়াতে এসেছো ভাল কথা। তার আগে আমার কিছু কথা শুনে নাও! অতঃপর তিনি যেমাদকে পবিত্র কুরআনের কয়েকটি আয়াত তিলাওয়াত করে শোনালেন। তিলাওয়াত শুনে যেমাদ দারুন ভাবে আকর্ষিত হলো।

সে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আয়াতগুলো পুনঃর্বার তিলাওয়াত করার অনুরোধ জানালো। এবারও তিলাওয়াত শুনে সে সীমাহীন ভাবে বিস্মিত ও বিমোহিত হলো এবং তার যেনো অতৃপ্ততা রয়েই গেলো সে তা দূর করতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আবার সে আয়াতগুলো তিলাওয়াত করার অনুরোধ জানালো। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবারও তিলাওয়াত করলেন। এভাবে সে আয়াত ক'টি তৃতীয় বারের মত শোনার পরে যেমাদের মধ্যে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন দেখা দিলো। অত্যন্ত বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠলো, আমি অনেক গণক ও ভবিষ্যৎ প্রবক্তার কথা শুনেছি কিন্তু এ আয়াত তা থেকে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। এ বাণী কতই না গভীর, কতই না মর্মস্পর্শী।

একথা বলেই সে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র চরণে নিজেকে সপে দিয়ে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! অনুগ্রহ পূর্বক আপনার হস্ত মুবারক সম্প্রসারিত করুন এবং এ অধমকে আপনার অনুগতদের অন্তর্ভূক্ত বানিয়ে নিন। এই ছিলো প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সংস্পর্শ ও বাণীর অপূর্ব আকর্ষণ।

যেমাদ এসেছিলো নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ভূত তাড়াতে এখন যা হলো, তাতে আমরা একথা ছাড়া আর কি বলতে পারি যে, ভূত ছাড়াতে এসে খোদ যেমাদকেই ভূতে পেয়ে বসেছে (!)

মু'জিযাহ

মক্কার কুরাইশদের নিপীড়নে শেষ পর্যন্ত প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরত করতে বাধ্য হন। দীর্ঘ পথ প্রান্তর মাড়িয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এগিয়ে চলছেন মদীনার পানে। দীর্ঘ সফরে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে পড়লেন। ক্ষুধায় হয়ে পড়লেন অস্থির। ইতিমধ্যে তাঁর নযরে পড়রো একটি তাবু, এগিয়ে গেলেন তিনি তাবুর কাছে। অতঃপর খাবার কিছু থাকলে তিনি তা দেয়ার জন্য তাদেরকে অনুরোধ করলেন। ঘরে তখন শুধু ছিলেন একজন মহিলা। তিনি ছাড়া অন্য কোন পুরুষ বাড়ীতে ছিলো

না। মহিলার নাম ছিলো উম্মে মা'বাদ। তিনি জানালেন, ঘরে খাবার মত কিছুই নেই।

সে ঘরের পাশেই তখন বাঁধা ছিলো হাড্ডিসার একটি বকরী। দুর্বল ও ক্ষীণকায় সে বকরীটির দুধের স্তন ছিলো একেবারে শুকনো। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ মহিলাকে বললেন, আপনি অনুমতি দিলে আমি বকরীটি দোহন করে কিছু দুধ লাভের চেষ্টা করতে পারি। মহিলা উত্তর দিলেন, এ বকরীটি বহুদিন যাবৎ কোন বাচ্চা দেয় না, এক ফোটা দুধ ও এ বকরীতে নেই, এ যাবৎ কোন দিনও এ বকরীটি আমাদেরকে দুধ দেয়নি। আর এটি এত বেশী দুর্বল যে, নিজে হেটে মাঠে গিয়ে ঘাস খাওয়ার ক্ষমতা পর্যন্ত রাখে না। সুতরাং আপনারা এ বকরীর স্তনে দুধ পাবেন কোথা থেকে ?

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আপনি শুধু অনুমতি দিন এরপর যদি কিছু না পাওয়া যায় তবে আর কি ? আমরা শুধু একটু চেষ্টা করে দেখি। সবশুনে মহিলা অনুমতি দিলেন। অনুমতি পেয়ে বিশ্বনবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বকরীটির কাছে এগিয়ে গেলেন এবং "বিসমিল্লাহ" বলে শুধু বকরীটির স্তনে হাত বুলালেন, আর অমনি বকরীটির স্তন দুধে ভরে গেলো। এবার নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপন মোবারক হাতে দুধ দোহন করতে থাকলেন। বকরীর দুধে একটি বড় পাত্র পূর্ণ হয়ে গেলো। এরপর প্রথমে তিনি উম্মে মা'বাদকে দুধ পান করতে দিলেন। তিনি তৃপ্তি সহকারে দুধ পান করলেন। অপ্রত্যাশিত এ দুধ লাভ করে তিনি পরম বিস্ময় ও আনন্দ উপভোগ করলেন।

এরপর সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.) গণসহ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তৃপ্তি সহকারে পেট ভরে দুধ পান করলেন। এ সময় বকরীটির স্তন দুধের ভারে ছিলো টলটলায়মান। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বিতীয় বার দুধ দোহন করে সে বড় পাত্রটি আবার পূর্ণ করে নিলেন এবং তথা হতে সামনের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। মহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র হাতের অলৌকিক স্পর্শের বরকতে বকরীটি দীর্ঘ দিন জীবিত ছিলো। এমনকি হযরত উমর (রাযি.)-এর শাসনকালে সংঘটিত ভয়ানক দুর্ভিক্ষের সময়েও সেটি বেঁচে ছিলো এবং মানুষকে তখনও ঐ বকরীটি দুধ দিয়ে উপকৃত করেছে।

অসাধারণত্ব

এক বাটি দুধ। সারা ঘর খুঁজে এছাড়া আর কিছুই পেলেন না প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম । এক পেয়ালা দুধ হলেও প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা একা পান করবেন না। তিনি হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) কে বললেন, যাও! আসহাবে সুফ্ফাকে সংবাদ দিয়ে নিয়ে এসো। হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) মনে মনে ভাবলেন, আমাকেই যদি দুধ টুকু পান করতে দেয়া হতো, তবে আমি তৃপ্তি সহকারে পান করতে পারতাম।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হুকুম মত তিনি আসহাবে সুফ্ফাকে ডেকে আনলেন। অতঃপর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) কে সে দুধ একে একে সকলকে পান করাবার হুকুম করলেন। হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) তাদেরকে দুধ পান করাতে শুরু করলেন। নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, সকলেই খুব তৃপ্তি সহকারে দুধ পান করলো। অতঃপর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে দুধ পান করতে বললেন। আমিও পান করলাম। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার বললেন, আরো পান কর, আমি আরো পান করলাম। তিনি পুনরায় বললেন, আরো পান কর, আমি আরো পান করলাম। তিনি পুনরায় বললেন, আরো পান কর। আমি এবার বিনীত কণ্ঠে আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি শপথ করে বলছি, আমার পেটে আর সামান্যতম জায়গাও নেই। এরপর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার হাত থেকে পেয়ালাটি নিজ হাতে নিলেন এবং বাকি দুধটুকু তিনি পান করলেন, এবং তিনিও পরিতৃপ্ত হলেন।

এ কোন সাধারণ বিবেক বুদ্ধি দিয়ে অনুধাবন করতে পারার মত বিষয় নয় বরং এ ছিলো এক অসাধারণ ও তাৎপর্যমন্ডিত বিশেষ বিষয়। যে দুধ টুকু মাত্র একজন মানুষের জন্য কোন মতে যথেষ্ট হতে পারে সে দুধ টুকুই আসহাবে সুফ্ফার সকল সদস্যসহ হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) এবং হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও তৃপ্তি ভরে পান করলেন। বিপুল সংখ্যক লোকের সকলেই সে দুধটুকু থেকে পান করে

পরিতৃপ্ত হলেন। তাতেও দুধ শেষ হলো না। অবশেষে পেয়ালা হাতে নিয়ে দেখা গেলো এখনো পেয়ালাতে ততটুকু দুধই আছে যতটুকু প্রথমে ছিলো। এরপর সেই টুকু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে পান করে নিলেন। সুবহানাল্লাহ!

অলৌকিকত্ব

খন্দক যুদ্ধকালীন সময়ের কথা। হযরত জাবির (রাযি.) প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দাওয়াত করবেন ইচ্ছা করে একটি ছাগল ছানা জবাই করলেন এবং তিন সের কিংবা তার চাইতে সামান্য বেশী গমের আটা তৈরী করে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে এসে চুপিসারে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! আপনি কয়েকজন সাহাবীকে নিয়ে দয়া করে আমার বাড়ীতে তাশরীফ গ্রহণ করুন। আমি সামান্য কিছু খাবারের ব্যবস্থা করেছি। তা দ্বারা আপনাকে মেহমানদারী করতে চাই।

হযরত জাবির (রাযি.)-এর দাওয়াত পেয়ে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খন্দক যুদ্ধে উপস্থিত প্রায় এক হাজার সাহাবীর (রাযি.) সকলকে সাথে নিয়ে হযরত জাবির (রাযি.)-এর বাড়ীতে গিয়ে হাযির হলেন। হযরত জাবির (রাযি.) কে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে দিয়ে ছিলেন, আমি এসে পৌছার পূর্ব পর্যন্ত চুলা থেকে পাতিল নামাবে না।

সাহাবায়ে কিরামের (রাযি.)-এর এক বিশাল কাফেলা নিয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হযরত জাবির (রাযি.)-এর বাড়ীতে উপস্থিত হলেন তখন হযরত জাবির (রাযি.) তো একেবারে হতভম্ব। তিনি ভাবলেন, ইয়া আল্লাহ! এত অল্প খাবার দ্বারা এত অধিক মুজাহিদের মেহমানদারী কি করে সম্ভব (!) তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ পবিত্র মুখ থেকে খানিকটা থুথু মুবারক নিয়ে পাতিল ও আটাতে মিশিয়ে দিলেন এবং বললেন, এ বিশেষ পাত্রসমূহ উনান থেকে সরাবে না, বরং উনানের উপর রেখে তথা হতেই খাবার বিতরণ করে দিতে থাক।

কথামত খাবার পরিবেশিত হতে থাকলো। এখানেই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এক আশ্চর্য ও অলৌকিক মু'জিযাহ প্রকাশ পেলো। আস্তে আস্তে সে খাবার থেকে খন্দকের যুদ্ধে উপস্থিত প্রায় এক হাজার সাহাবীর (রাযি.) সকলেই আহার করলেন। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, যখন তরকারীর পাত্রের ঢাকনা তোলা হলো, তখন দেখা গেলো খাবার একটুও কমেনি।

এ জাতীয় আরো অজস্র ঘটনা বর্ণিত রয়েছে ইসলামী ইতিহাসের পাতায় পাতায়। এসবের মাঝে একদিকে যেমন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অসাধারণত্ব ও অলোকিকত্ব প্রকাশ পায়, অপর দিকে এসব বিমোহিতকর ও চিত্তাকর্ষক বিষয়াদির মধ্যে চরম ইসলাম বিরোধী কট্টর মানুষেরা ও শুনতে পায় ইসলামে অনুপ্রবেশের এক মৌন আহ্বান খুঁজে পায় ইসলামের সত্যতা ও হক্কানিয়্যাতের শক্তিশালী প্রমাণ।

আনন্দ-কৌতুক

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসি-মযাকের ক্ষেত্রে কখনোই নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাননি। আবার সর্বদা একেবারে মুখ ভার করেও বসে থাকেননি। বিভিন্ন সময়ে তিনি নিয়ন্ত্রিত পর্যায়ের মযাক করেছেন। তবে তার মধ্যেও নিহিত ছিলো শিক্ষা যেখানে বাস্তবতা পরিপন্থী কোন কথার স্থান ছিল না কখনো। এমনি একটি ঘটনা–

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.) এবং হযরত আলী (রাযি.) কে সাথে নিয়ে খেজুর খাচ্ছিলেন, তিনি খেজুর খেয়ে খেয়ে তার বিচিগুলো হযরত আলী (রাযি.)-এর দিকে রাখছিলেন। এভাবে যখন হযরত আলী (রাযি.)-এর সামনে অনেকগুলো বিচি জমা হলো তখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কৌতুকের ছলে হযরত আলী (রাযি.) কে বললেন, আলী! তুমি আজ অনেক খেজুর খেয়েছো (তোমার সামনের বিচি তাই প্রমাণ করছে) হযরত আলী (রাযি.) ও অত্যন্ত তীক্ষ্ণ উপস্থিত বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত আদব ও বিনয়ের সাথে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ্য করে বললেন, আপনিও কম খাননি- তবে আপনি

হয়তো বিচিসহই খেয়ে ফেলেছেন, বিধায় আপনার সামনে কোন বিচি নেই। হযরত আলী (রাযি.)-এর জবাব শুনে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুচকী হাসলেন।

অন্য একদিনের কথা–

এক বৃদ্ধা মহিলা এলো প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে। সে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খিদমতে আরয করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! আপনি আমার জন্য দু'আ করুন, যাতে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। বৃদ্ধার এ আবেদনের পরে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খানিকটা কৌতুক জড়ানো কণ্ঠে বললেন, "কোন বৃদ্ধাই বেহেশ্‌তে যাবে না।" একথা শুনে বৃদ্ধা মহিলা ভয়ানক ভাবে ভয় পেয়ে মনকষ্টে ক্রন্দন করতে লাগলো।

কাঁদতে কাঁদতে বৃদ্ধা মহিলা যখন ফিরে যাচ্ছে তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ডেকে বললেন, কোন বৃদ্ধা ঠিকই জান্নাতে যাবে না কারণ জান্নাতে যাওয়ার পূর্বে সব বৃদ্ধা মহিলাই যুবতীতে পরিণত হয়ে যাবে। যেমনটি পবিত্র কুরআনেও ইরশাদ হয়েছে "আমি জান্নাতী রমনীগণকে বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর তাদেরকে চির কুমারী রূপে তৈরী করেছি।

অর্থাৎ জান্নাতে যাওয়ার পূর্বে বৃদ্ধা রমনীকেও যুবতী ও চির কুমারী বানিয়ে অতঃপর বেহেশতে প্রবেশ করানো হবে।

সংযত হাসি

পিয়নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সবকিছুই ছিল অনুসরনযোগ্য তাঁর চলন-বলন খানা-পিনা এমনকি হাসিও ছিল সংযত ও অনুসরনীয়। এখানে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাসির কথাই বলা হচ্ছে।

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিতান্তই সংযত পর্যায়ের হাসি হাসতেন। হযরত আইশা সিদ্দীকা (রাযি.) সম্পর্কে একটি ঘটনা বর্ণিত আছে। একবার এক অন্তরঙ্গ মুহূর্তে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আইশা সিদ্দীকা (রাযি.) কে বললেন, আইশা! তুমি যদি আমার আগে ইন্তেকাল কর তবে তোমার তাতে ক্ষতি কি ? বরং

এতেই তো তোমার বেশী লাভ। কারণ এমনটি হলে আমি নিজের হাতে তোমাকে গোসল করাবো, কাফন পরাবো, আমিই জানাযার নামায পড়াবো, অতঃপর আমার হাতেই তোমাকে কবরে সমাহিত করবো।

শত হলেও হযরত আইশা (রাযি.) একজন মহিলা মানুষ ছিলেন। তাঁর মাঝেও মেয়েলী ঈর্শনীয় মনোভাব বিরাজমান ছিলো। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একথা শুনে হযরত আইশা সিদ্দীকা (রাযি.) প্রভাবিত হয়ে গোস্বার স্বরে জবাব দিলেন– জি হ্যাঁ, এসবই তো আপনি করবেন, আর এর সাথে আরো একটি কাজ করবেন, আর তা হচ্ছে সেদিন আমার ঘরে আপনি অন্য কোন বিবিকে নিয়ে রাত্রি যাপন করবেন। ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! আমি কি আপনার উপর কোন বোঝা হয়ে গেছি ? প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের মাহবুবা জীবন সঙ্গীনীর মুখ থেকে এহেন গোস্বা ভরা অভিমানী জবাব শুনে হেসে ফেললেন। অবশ্য সে হাসি ছিলো অত্যন্ত সংযত মুচকী হাসি। যেখানে ছিলো না হো হো কিংবা হি হি পর্যায়ের কোন অশোভনীয় আওয়ায। ছিল না অট্টহাসির কোন শ্রুতিকটু শব্দ। এরপরও কি আমরা শিক্ষা নেব না?

হৃদয়ের কোমলতা

অষ্টম হিজরীর কথা। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জ্যেষ্ঠ কন্যা হযরত যয়নব (রাযি.) ইন্তেকাল করলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিজস্ব তত্ত্বধানে তাঁর দাফন কাফনের কাজ সম্পন্ন হলো। লাশ যখন কবরের সামনে রাখা হলো, তখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র আঁখি যুগল থেকে অঝোরে অশ্রু ঝরছিলো। কিন্তু তখনো তিনি মুখে কোন বাক্যই ব্যয় করেননি।

অন্য এক সময়ের কথা–

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শিশু পুত্র হযরত ইবরাহীম মুমূর্ষ অবস্থায় উপনীত। নিজের চোখে নিজ সন্তানের এহেন অবস্থা দর্শন করে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দু'চোখে অশ্রু নেমে এলা। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাযি.) জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! একি ?

আপনিও যে কাঁদছেন ? তখন তিনি জবাব দিলেন, এ হচ্ছে আল্লাহ পাকের রহমত।

এ থেকে এ কথাই স্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয় যে, প্রিয়নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও আমাদের মত মানুষ ছিলেন, তার মনেও ছিল পুত্র-কন্যাদের প্রতি পিতৃশুলভ মায়া, মমতা, স্নেহ ও ভালবাসা।

তবে একথা খুবই স্পষ্ট যে, এ স্নেহ-মমতা কখনোই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইসলামের নীতি-আদর্শের বাস্তবায়নে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারেনি বরং হাজারো স্নেহ-মমতার মাঝেও নীতি ইসলামী নীতি-বিধান বাস্তবায়নে ছিলেন অটল-অবিচল।

লাজ-শরম

নির্লজ্জ সমাজ ব্যবস্থায় অশ্লীলতার শ্রোত যখন তীব্র গতিতে প্রবাহমান। পবিত্র কা'বা গৃহ বিবস্ত্র অবস্থায় প্রদক্ষিণ করাকে যখন ইবাদত বলে জ্ঞান করা হতো। সে মানবতাহীন বৈরী পরিবেশেও শিশু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের লাজ-শরম ও সম্ভ্রম যথাযথ ভাবে সংরক্ষণ করেছেন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর লাজ-শরম একজন কুমারী মেয়ের লাজ-শরমের চাইতেও বেশী ছিলো।

পবিত্র কা'বাগৃহ পুনঃনির্মাণ কালে আবাল, বৃদ্ধ-বনিতা নির্বিশেষে সকলেই পরিধেয় বস্ত্র খুলে মাথায় বেঁধে পাথর বয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও সকলের সাথে পাথর বহন করছিলেন। কিন্তু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পরনে তখনো বস্ত্র ছিলো। কচি ও নম্র শরীর বিধায় অমসৃন পাথরের ঘায়ে শরীর বা মাথায় ক্ষত হয়ে যেতে পারে ভেবে চাচা আব্বাস (রাযি.) পরনের লুঙ্গি খুলে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাথায় বেঁধে দিলেন। আর অমনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেহুঁশ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন, চোখ দু'টো বড় বড় হয়ে গেলো, কিছুক্ষণ পরে হুঁশ ফিরে এলে তিনি বলতে লাগলেন, আমার লুঙ্গি! আমার লুঙ্গি!! সাথে সাথে হযরত আব্বাস (রাযি.) নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লুঙ্গি পরিয়ে দিলেন।

হযরত তুফাইল (রাযি.) বর্ণনা করেন, যখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সতর নগ্ন করা হলো। সাথে সাথে তিনি একটি গায়েবী আওয়ায শুনতে পেলেন "হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! তোমার লজ্জাস্থানকে নগ্নতা থেকে রক্ষা কর, তোমার সতর হিফাযত কর।" আর এটিই ছিলো প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শ্রুত সর্বপ্রথম অদৃশ্যের আওয়ায।

অপর এক বর্ণনায় আছে যে, প্রিয়নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর লুঙ্গি খোলা হয়নি বরং হযরত আব্বাস (রাযি.) শুধু তাকে লুঙ্গি খুলে মাথায় বেঁধে নিতে বলেছিলেন, আর তিনি তার কথা শুনে লুঙ্গি খুলবেন কি না তা ভাবছিলেন এ ভাবনার এক পর্যায়ে কাপড় খুললে কেমন শরম হবে সে অনুভূতিতেই তিনি বেহুশ হয়ে জমিনে লুটিয়ে পড়েছিলেন।

সুবহানাল্লাহ ওয়াল হামদুলিল্লাহ ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার।

যৌবনে প্রবৃত্তি দমন

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপন যৌবনে কুপ্রবৃত্তির চাহিদা দমন ও নিয়ন্ত্রনের ক্ষেত্রে এমন বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, যা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর পবিত্রতা ও প্রবৃত্তি দমনের চাইতেও অধিক বিস্ময়কর ছিল। যৌবনের শুরু থেকে পঁচিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত মানুষের মন বিভিন্ন কামনা-বাসনা ও উচ্চাভিলাসে পূর্ণ থাকে। কিন্তু যৌবনের এ প্রধান অংশটাই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাটিয়েছেন সম্পূর্ণ একা। তখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ স্বভাব ও চরিত্রকে এত উন্নত ও পবিত্র রেখেছেন, যার ফলে কোন দুশমনও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চারিত্রিক ব্যাপারে সামান্যতম অপবাদ দেয়া কিংবা অঙ্গুলী নির্দেশ করার অবকাশ পায়নি।

আবু জাহল ও তার দলবল কঠোর থেকে কঠোরতম বিরোধিতায় লিপ্ত ছিলো। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মস্তিষ্ক বিকৃত পাগল, মাতাল, জাদুকর ইত্যাদিসহ হাজারো রকমের মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগে অভিযুক্ত করতো। কিন্তু এত কিছুর পরেও এ পবিত্র জীবনে

কোনরূপ চারিত্রিক অভিযোগ উত্থাপনের সাহস পর্যন্ত কেউ করেনি। এ দুশমন গোষ্ঠী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবনে সামান্যতম স্পট খুঁজে পেলেই তাকে অপ প্রচারের বিরাট হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতো, কিন্তু ওরা তা পারেনি, কারণ ফুলের ন্যায় শিশির শুভ্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চরিত্রের অদ্ভূত সচ্ছতা ও পরিচ্ছন্নতা তাদেরকে মুখ খোলার সুযোগ পর্যন্ত দেয়নি।

দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর একাকী জীবন যাপনের পরও তিনি কোন সুন্দরী যুবতী মেয়েকে বিয়ে করেননি বরং চল্লিশ বছরের এক বিধবা মহিলাকে তিনি পত্নী হিসেবে বরণ করেন। যখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বয়স ছিলো মাত্র পঁচিশ বছর। তবে যে বিধবা মহিলাকে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বরণ করলেন, তিনিও ছিলেন সারা আরবে সৎ স্বভাব ও উন্নত গুণাবলীর কারণে প্রসিদ্ধ। লোকেরা তাকে ডাকতো "ত্বাহিরা" বা পবিত্রতার অধিকারীনী মহিলা নামে। আর সে দিকটি লক্ষ্য করেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ প্রৌঢ়া মহিলাকে পত্নী হিসেবে গ্রহণ করে নিলেন।

হযরত খাদীজা (রাযি.)-এর সাথে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বৈবাহিক জীবন ২৮ বছর স্থায়ী ছিলো। এর মধ্যে নবুওওতের পূর্বে পনেরো বছর আর নবুওওতের পরে তের বছর, নবুওওতপূর্ব পনেরো বছরের বেশীর ভাগ সময় ব্যবসা, জনসেবা ও নির্জনে সাধনা অধ্যাবসায়ের মাধ্যমেই কেটেছে। আর নবুওওত পরবর্তী তের বছর ইসলামের দাওয়াতও তাবলীগ এবং এক্ষেত্রে কাফির গোষ্ঠীর অমানবিক অত্যাচার ও নির্যাতন সহ্য করেই কাটাতে হয়েছে। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বয়স যখন তিপ্পান্ন বছর তখন হযরত খাদীজা (রাযি.) ইন্তিকাল করেন। হযরত খাদীজা (রাযি.)-এর বয়স তখন আটষট্টি বৎসর। এ সময় পর্যন্ত নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্য কোন মহিলার সাথে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হননি।

জীবনের প্রায় পুরোটাই তিনি এক প্রৌঢ়া মহিলাকে নিয়ে কাটিয়ে দিলেন। এর থেকেই বুঝা যায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ প্রবৃত্তিকে কিভাবে অবদমিত করেছিলেন।

সত্য-ন্যায়ের অনুসরণ

আরবের একটি নষ্ট প্রাপ্ত ও ভ্রান্ত সমপ্রদায়ের মাঝে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। যাকে তৎকালীন বিশ্বের সকল জাতির মাঝে সবচাইতে নিকৃষ্ট জাতি ও সম্প্রদায় বলে আখ্যায়িত করা হলে তা অত্যুক্তি হবে না। কিন্তু তার মাঝে যুবক নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সত্যানুসন্ধিৎসু মনোভাব গোটা জাতি ও সমপ্রদায়ের মাঝে তাঁকে এক ব্যতিক্রমী বৈশিষ্টপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রমাণিত করতে সক্ষম হয়েছিলো। দীর্ঘ দিনের বিগ্রহ আর প্রবৃত্তি পুজা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কলুষমুক্ত পবিত্র জীবনে কোনই প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি।

বিভিন্ন ভুত প্রেত আর বিগ্রহের নামে উৎসর্গকৃত খাদ্য দ্রব্য যখন সকলেই ভক্তি শ্রদ্ধার সাথে ভক্ষণ করতো, তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে সে খাদ্য উপস্থাপন করা হলে তিনি পরিস্কার ভাষায় বলে দিতেন, আমি শুধু ঐসকল খাদ্যই গ্রহণ করবো যাতে আল্লাহ পাকের নাম নেয়া হয়েছে (ফাতহুল বারী)।

তৎকালীন লোকদের মাঝে তাদের ভ্রান্ত ধর্মের বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের গুরুত্ব ছিলো প্রচুর। কিন্তু তা সত্ত্বেও যুবক নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে সব আচার অনুষ্ঠান থেকে দূরে থাকতেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চাচা ফুফুরা হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাথে নিয়ে যাওয়ার আগ্রহ দেখাতো, চেষ্টা করতো, কিন্তু প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে যেতে অস্বীকার করতেন। এরপরেও যদি আত্মীয়-স্বজনের পক্ষ থেকে খুব বেশী পীড়া-পীড়ি করা হতো তবে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘর থেকে বের হয়ে অন্যত্র চলে যেতেন।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সকলের তুলনায় ভিন্ন ও ব্যতিক্রমী চালচলন লক্ষ্য করে অনেকে ধারণা করতো যে, তিনি হয়তো জীন-ভূতের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ভয়তে এসব অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ থেকে বিরত থাকছেন। এজন্য তারা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতো তোমার নীতি-নৈতিকতা যথেষ্ট উন্নত বিধায় তুমি এমন অমুলক সন্দেহ পোষণ করো না যে, তোমাকে প্রভু কোন জীন-ভূতের দ্বারা

আক্রান্ত করবেন (ফাতহুল বারী)। তাদের একথা শৈশব-যৌবনে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উত্তম ও উন্নত স্বভাবের একটি সুস্পষ্ট স্বীকৃতি ছিলো।

যদি প্রশ্ন করা হয়-মূর্তি পূজায় ডুবন্ত জাতির মাঝে জন্ম নিয়ে, তাদের সমাজে বসবাস করেও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মধ্যে মূর্তি প্রতিমার প্রতি প্রকৃতিগত ভাবে এহেন ঘৃণা ও অনীহা সৃষ্টি হওয়া কিভাবে সম্ভব হলো ? তবে তার একটিই জবাব যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উস্তাদ ছিলেন স্বয়ং রাব্বুল আলামীন। মহান আল্লাহ পাকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বধানে ও নির্দেশেই তিনি পরিচালিত হয়েছেন। মহান আল্লাহ পাকই তাকে সকল পাপ পঙ্কিলতা থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, আর এর কারণ হলো অদূর ভবিষ্যতেই তিনি গোটা বিশ্ববাসীর জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবেন এবং সকলের নীতি-নৈতিকতা, সভ্যতা-ভব্যতা, আখলাক-চরিত্রের একজন আদর্শ শিক্ষক হিসেবে তাঁর বহিঃপ্রকাশ ঘটবে।

গান-বাজনা পরিহার

জীবনের শুরু থেকে নবুওওত লাভের পূর্ব পর্যন্ত মহান আল্লাহ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যাবতীয় নিন্দনীয় কর্মকান্ড থেকে সম্পূর্ণ রূপে সংরক্ষিত রেখেছেন। বিশেষতঃ যৌবন বয়সে মানব প্রকৃতিতে যে সব কামনা-বাসনার সৃষ্টি হয়ে থাকে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা থেকেও ছিলেন সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র। তৎকালীন সময়ে গান-বাজনার ব্যাপক ছড়াছড়ি সত্ত্বেও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি দিনও ওসব আসরে যোগদান করেননি। সাময়িকভাবে কখনো সামান্য মনোভাব সৃষ্টি হলেও মহান আল্লাহ বিশেষ তত্ত্বাবধানে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তা থেকে হিফাযত করছেন।

হযরত আলী (রাযি.) থেকে একটি বর্ণনা রয়েছে, তিনি বলেছেন, আমি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যৌবনকালে জাহিলী যুগের গর্হিত ও নিন্দনীয় কার্যকলাপে অংশগ্রহণের কোন ইচ্ছাও আমার মনে সৃষ্টি হয়নি। তবে দু'বার আমার মনে (সঙ্গী-সাথী ও পারিপার্শিকতার

প্রভাবে) সামান্য ইচ্ছা সৃষ্টি হলেও মহান আল্লাহ আমাকে তা থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, একবার আমি বকরী চড়াতে মাঠে গেলাম, এবং আমার এক সাথীকে বললাম, ভাই ! তুমি আমার বকরীগুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখো, আমি মক্কা গিয়ে কিছু কিচ্ছা-কাহিনী শুনে আসি। একথা বলে আমি রওয়ানা করেছিলাম, ইতিমধ্যে এক জায়গায় গানের আওয়ায শুনতে পেলাম। লোকদের জিজ্ঞাসা করলাম, তারা জবাব দিলো, ঐ বাড়ীতে অমুকের বিবাহ অনুষ্ঠিত হচ্ছে কিনা, তাই তারা গান-বাজনা করে আনন্দ-উল্লাস করছে। তখন আমার মনে একটা ভাব সৃষ্টি হলো, আমি চিন্তা করলাম, এখানে বসেই কিছুক্ষণ গান শুনবো। আমি সে মতে এক জায়গায় বসে গেলাম। কিন্তু সাথে সাথে মহান আল্লাহ আমার কানে মহর মেরে দিলেন। আমি তখন আর কিছুই শুনতে পেলাম না। আমার চোখে ঘুম নেমে এলো আমি শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি মহান আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমার চোখে আল্লাহপাক এমন ঘুম দিলেন যে, এক ঘুমে রাত্র শেষ হয়ে যখন সকাল হলো তখন আমার চোখে সূর্যের কীরণ পড়ায় আমি জেগে উঠলাম। সকালে উঠে আমি যখন আমার সে সাথীর কাছে মাঠে ফিরে গেলাম তখন সে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, বলো তুমি কি শুনে এলে ? আমি তাকে পুরো বিষয়টি বিস্তারিত ভাবে বললাম।

পরের দিনও আমার মনে সে একই ইচ্ছা জাগলো, এবারও আমি শহরের পথ ধরে রওয়ানা হলাম, কিন্তু মহান আল্লাহ এবারও আমার চোখে ঘুম দিয়ে দিলেন। এবং আমি গান শুনা থেকে বেঁচে গেলাম। এরপর থেকে আর কোনদিন আমার মনে এ জাতীয় কোন ধ্যান-ধারণা বা ইচ্ছার সৃষ্টি হয়নি। (খাসায়েসে কুবরা ১/৮৮)

এ ছিলো মহান শিক্ষক নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যৌবনের তারুন্য দীপ্ত সময়ে তদানীন্তন সমাজে ব্যাপক ভাবে প্রচলিত গান বাজনা থেকে বেঁচে থাকার অবস্থা। কারণ তিনিই তো হবেন সে নবী যিনি সারা দুনিয়ার মানুষের উত্তম চরিত্র গঠন ও তাদেরকে সভ্যতা-ভব্যতার প্রশিক্ষণ দিয়ে আদর্শ মানুষে পরিণত করার মহান দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবেন। সুতরাং সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রকৃতি ও স্বভাব এমনি স্বচ্ছ ও পবিত্র হওয়াই তো বাঞ্ছনীয়।

শান্তি প্রচেষ্টা

আগামী দিনের শ্রেষ্ঠ নবী আজকের যুবক হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভ্রান্ত ও নিন্দনীয় কাজ থেকে সর্বদা কঠোর ভাবে বিরত থেকেছেন। পক্ষান্তরে জন কল্যাণকর শান্তিমূলক ভাল কাজে ভূমিকা রাখার কোন সুযোগই তিনি হাত ছাড়া করেননি, বরং বিভিন্ন ক্ষেত্রে চিন্তা-ভাবনা করে জন-মানব কল্যাণের পথ উদ্ভাবন করতেন। যুদ্ধাংদেহী মনোভাবের অনিষ্টকর কুয়াশায় আচ্ছাদিত আরব বাসীদের মাঝে যুদ্ধ বিগ্রহ লেগেই থাকতো। ইতোমধ্যে কুরাইশদের মাঝে একটি বড় ধরণের যুদ্ধ (হরবে ফিজার) সংঘটিত হলে চিন্তাশীলদের মাঝে এক নতুন চিন্তা-ভাবনার সূচনা হলো। তারা কোন মুক্তির পথ উদ্ভাবনের কথা ভাবতে লাগলো।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাদের মধ্যকার নেতৃস্থানীয়দের সাথে নিয়ে একটি শান্তি আলোচনার ডাক দিলেন। এজন্য তিনি একটি সাধারণ সভা আহবান করলেন। অতঃপর বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারাসহ একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হলো। যার নাম দেয়া হলো "হিলফুল ফুযূল"। শান্তি চুক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এ সংগঠনের বিশেষ বিশেষ ধারাগুলো ছিলো–

(১) আমরা দেশের অশান্তি দূর করার জন্য যথা সাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাবো।

(২) বিদেশী লোকদের জান-মাল ও মান-সম্ভ্রম রক্ষার ক্ষেত্রে আমরা চেষ্টায় কোন রূপ ত্রুটি করবো না।

(৩) দরিদ্র ও অসহায় লোকদের সার্বিক ভাবে সহায়তা দান করতে আমরা কোন রূপ কুণ্ঠিত হবো না।

(৪) অত্যাচারী এবং তার অত্যাচারকে দমিত ও ব্যাহত করতে এবং দুর্বল দেশবাসীকে অত্যাচারীর কবল থেকে রক্ষা করতে আমরা প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাবো।

তখনকার আত্ম-কলহ ও বিদ্বেষপূর্ণ আরবে শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে এ ছিলো এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এ শান্তি চুক্তি ও জনকল্যাণকর প্রতিজ্ঞায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ার পর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কস্মীনকালেও তার ব্যতিক্রম কিছু করেননি।

কিন্তু আরবের কুরাইশ সম্প্রদায় তাদের স্বভাব সুলভ ভাবে এ প্রতিজ্ঞার উপরও টিকে থাকেনি বরং তারা তা ভঙ্গ করেছিলো।

নবুওওত প্রাপ্তির পর একবার "হিলফুল ফুযূল" সম্পর্কে কথা উঠলে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, নবুওওত ও ইসলামের আগমনের পরে আজো যদি কেউ আমাকে এ জাতীয় শান্তি প্রতিষ্ঠায় আলোচনার জন্য আহবান করে, তবে আমি অবশ্যই সে আহবানে সাড়া দিব। অর্থাৎ মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সকল ভাল ও মঙ্গলজনক কাজে সহায়তা প্রদর্শনই ইসলামের নীতি ও মৌলিক উদ্দেশ্য বিধায় আমি তার উপর অবিচল থাকবো। (ইবনে সা'দ, ১/৮২)

এতো গেল প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুওওত পূর্ব যৌবন বয়সের অতুলনীয় আদর্শের কিঞ্চিত নমুনা। নবুওওত লাভের পরও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ আদর্শ ও উন্নত গুণাবলীর আঁধার ছিলেন। পূর্বের উন্নত গুণাবলীর সাথে এবারে নতুন ভাবে আদর্শিক সংযোগ সৃষ্টি হলো। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুওওত পরবর্তী তেইশ বছরের জীবন ছিলো সারা দুনিয়ার যাবতীয় উত্তম গুণাবলী, সৎ-স্বভাব ও ন্যায়পরায়ণতার একমাত্র উৎস। কেউ সততা ও ন্যায় পরায়ণতার দাবীদার হতে হলে তাকে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবনাদর্শ থেকে শিক্ষা গ্রহণ ছাড়া দ্বিতীয় আর কোন পথ নেই।

ছোটদের প্রতি স্নেহ-মমতা

বিশ্ববাসীর আদর্শ প্রশিক্ষক প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছোটদের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ ও মমতা প্রদর্শন করতেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদর স্নেহ পেলে ছোটরা তাদের দুঃখ কষ্ট ভুলে যেতো। তাদের শখের খেলা-ধুলা বন্ধ করেও তারা হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সান্নিধ্যে কাটাতে ভাল বাসতো। আদর-স্নেহের মধ্য দিয়ে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছোটদের সৎ স্বভাব ও উন্নত নীতি-নৈতিকতার প্রশিক্ষণ দিতেন। আদরের সময় আদর আবার উপদেশ দানের সময় উপদেশ দানই ছিলো নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদর্শিক মূলনীতি। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম একজন বাপ হিসেবে নিজের ছেলে-মেয়েদের সাথে, একজন নানা হিসেবে নিজের নাতী-নাতনীর সাথে, একজন চাচা হিসেবে নিজের ভাতিজা-ভাতিজীদের সাথে, এবং একজন মুনিব হিসেবে নিজের অধীনস্থ গোলাম ও চাকরদের সাথে যে আচার-আচরণ প্রদর্শন করেছেন, তা যুগ যুগ ধরে বাপ, দাদা, নানা, চাচা ও মুনিবদের জন্য উত্তম আদর্শ হয়ে আছে।

সাধারণতঃ মানুষ আত্মিক দিক থেকে ব্যাপক উন্নতি সাধন করলে সে ক্ষেত্রে ছেলেমেয়ে ও স্ত্রী-পরিজন থেকে সম্পর্কহীন হয়ে পড়ে। আবার কেউ দুনিয়ার প্রতি ঝুকে পড়লে সে ক্ষেত্রে পুত্র-পরিজনের মায়া-মমতায় ডুবে গিয়ে ধর্ম-কর্ম ভুলে যায়। কিন্তু প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবন ছিলো-এর ব্যতিক্রম। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবন এমন উন্নত ও আদর্শিক জীবন, যে জীবনে একদিকে স্ত্রী ও পুত্র-পরিজনের প্রতি ছিলো অপরিসীম মায়া মমতা ও ভালবাসা। অপরদিকে পরকালের বিশ্বাস ও লক্ষ্য হেতু তাদের শিক্ষা-দীক্ষাসহ নিজ ধর্ম-কর্মের প্রতিও ছিলো যথেষ্ট সচেতনতা। এ ধরণের মধ্যম পন্থায় সুপ্রতিষ্ঠিত জীবনই হতে পারে মানুষের অনুকরণ ও অনুসরণযোগ্য।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবনের সবচাইতে বড় বৈশিষ্ট হলো, তিনি নীতি নৈতিকতা ও রাজনৈতিক সংস্কার কাজের বৃহত্তর দায়িত্বে নিয়োজিত থাকার পরও নিজ সন্তান-সন্ততি ও উম্মতদের ছোট খাট বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছেন। (সীরাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম , ৬/১৬২)

অত্যাধিক মায়া মমতা সত্ত্বেও প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্তানদের চারিত্রিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কোনরূপ অবহেলা ও নম্রতা প্রদর্শন করেননি। তেমনি ছোট বড় নির্বিশেষে সকলকে ন্যায় নীতির মান দন্ডে বিচার ও শাস্তি প্রয়োগ করার ব্যাপারেও তিনি অত্যন্ত কঠোর ছিলেন।

একবার মাখযূম গোত্রের ফাতিমা নাম্নী এক মহিলা চুরির অপরাধে অপরাধী হলে তার আত্মীয় স্বজনরা হযরত উসামা (রাযি.)-এর মাধ্যমে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে সুপারিশ করালো।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জবাবে বললেন, আমি আল্লাহপাকের শপথ করে বলছি, যদি এ ফাতিমার পরিবর্তে আমার কলিজার টুকরা ফাতিমাও চুরির অপরাধে অপরাধী হত, তবে তার হাত কাটার নির্দেশ দিতেও আমি কোনরূপ কুণ্ঠাবোধ করতাম না।

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ সন্তানদেরকে একথা পরিস্কার ভাবে বলে কঠোরভাবে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন যে, আমি আদর্শিক ও নীতিগত দিক থেকে কারো প্রতি সামান্যতমও নম্রতা প্রদর্শন করতে পারবো না। সুতরাং তোমরা আমার মায়া-মমতা ও দয়া অনুকম্পা দেখে ভুল ধারণার স্বীকার হবে না।

বড়দের প্রতি সদাচরণ

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অতুলনীয় জীবনাদর্শে বড়দের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, উন্নত ও মনোরম আচরণের এক বেনযীর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায়। বড়দের প্রতি যথাযথ সদাচরণের এহেন দৃষ্টান্ত দ্বিতীয় আর নেই। একজন মানুষ মর্যাদার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহন করার পরও নিজের তুলনায় শুধু বয়সে বড় হওয়ার কারণে তার প্রতি চূড়ান্ত শ্রদ্ধা নিবেদনের দৃষ্টান্ত কেবল নবী আদর্শেই খুঁজে পাওয়া সম্ভব। এ ক্ষেত্রে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে মাতা-পিতা, চাচা-চাচী, মামা-মামীসহ সকলেই ছিলেন সমান শ্রদ্ধার পাত্র। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পারিবারিক জীবন পর্যালোচনা করলে আমরা তা যথার্থ ভাবে অনুধাবন করতে পারি।

জন্মের পূর্বেই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পিতা ইন্তেকাল করলেন। শৈশবকালে তিনি স্নেহময়ী মাতাকে হারালেন। কিন্তু জন্ম থেকে শুরু করে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি তাদের ভুলতে পারেননি। যখনই স্মরণ হতো দু'হাত তুলে আল্লাহ পাকের দরবারে তাদের জন্য তিনি দু'আ করতেন। মাতৃ-পিতৃহীন ইয়াতীম নবী চাচা আবু তালিবের তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হলেন। চাচাকে কোন কাজ করতে দেখলে দৌড়ে গিয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে কাজটি করে দিতেন। সম্ভব না হলেও অন্ততঃ সহযোগিতা করতেন। আবু তালিবের মক্কার দোকানে তিনি উল্লেখযোগ্য ভাবে সহযোগিতা করতেন।

একবার চাচা আবু তালিব অসুস্থ হয়ে পড়লে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে দেখতে গেলেন। আবু তালিব হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বললেন, তুমি শুধু আমাকে দেখতে আর আমার খোঁজ খবর নিতে এলে ? যে আল্লাহ্ তোমাকে তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিসেবে পাঠিয়েছেন তাঁর কাছে আমার জন্য একটু দু'আ কর না কেন ?

একথা শুনে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপন শ্রদ্ধেয় চাচার জন্য আল্লাহ্ পাকের দরবারে দু'হাত উঁচিয়ে প্রার্থনা করলেন। সাথে সাথে আবু তালিব সুস্থ হয়ে উঠে বসলেন। আর বললেন, মুহাম্মদ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রভু স্বয়ং তোমার কথা মানেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুযোগ পেয়ে বললেন, চাচাজান! আপনিও যদি আমার কথা মেনে নেন তবে আল্লাহ্পাক আপনার কথাও মেনে নিবেন। (সীরাতুন্নবী সা. প্রথম খণ্ড)

সীরাতে ইবনে হিশামের এক বর্ণনা মতে আবু তালিব ইন্তিকালের পূর্বে কালেমা পড়ে মুসলমান হয়েছিলেন। আল্লামা শিবলী (রহ.) আবু তালিবের ইসলাম গ্রহণের বর্ণনাটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। অবশ্য কারো কারো মতে এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য না করাই ভাল। (আখলাকে রাসূলে আকরাম সা. পৃ. ৪৭)

আপন দুধ মাতা-পিতার প্রতি ছিলো প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অগাধ ভক্তি ও শ্রদ্ধা। প্রকৃত পিতা মাতার মতই তিনি তাদেরকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন এবং তাদের হক ও অধিকার স্বীকার করতেন। একবার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দুধ মাতা হযরত হালীমা সা'দিয়া (রাযি.) নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে এলে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভক্তির আতিসহ্যে আমার আম্মা ! আমার আম্মা ! বলতে বলতে তার কাছে গেলেন।

হযরত হালীমা (রাযি.)-এর স্বামী হযরত হারেস (রাযি.) একবার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে স্বাক্ষাৎ করতে এলে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের গায়ের চাদর মুবারক খুলে তার জন্য যমীনে বিছিয়ে দিলেন। অতঃপর হযরত হারেস (রাযি.) কিয়ামত সম্পর্কে জানতে চাইলে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

বললেন, আব্বাজান ! যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন, আমি আপনার হাত ধরে বলে দিব এই দেখুন আব্বা- আজ কিয়ামত কায়েম হয়ে গেছে।

হযরত হারেস (রাযি.) এ ঘটনাটি খুব আগ্রহ ও গর্বের সাথে বর্ণনা করতেন। তিনি বলতেন, আমার ছেলে কিয়ামতের দিন যখন আমার হাত ধরবে বলে জানিয়েছে সেমতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস সে আমাকে সেদিন জান্নাতে না নিয়ে ছাড়বে না। আবু তালিবের ইন্তেকালের পর তাঁর স্ত্রী হযরত ফাতিমা বিনতে আসাদ (রাযি.) আবু তালিবের মতই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে সদাচরণ করতেন। তিনি ইন্তেকালের পর হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ চাচীর কবর নিজেই খনন করলেন। অতঃপর সে কবরে প্রথমে নিজে শুয়ে পড়লেন। এর পর আপন জামা দ্বারা তাকে কাফন পরিয়ে কবরে রাখলেন। (জযবুল কুলূব /২১৪)

ইয়াতীম অসহায়দের প্রতি দয়া

রহমতে আম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়াতীম, দুঃস্থ ও অসহায়দের প্রতি অপরিসীম দয়া, অনুকম্পা ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করতেন। অনেক দুঃস্থ অনাথের মুখে তিনি হাসি ফুটিয়েছেন।

সপ্তম হিজরীতে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমরা সম্পাদন করে মদীনা ফিরার পথে একটি হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণা ঘটলো। নির্মমভাবে শাহাদাত বরণ কারী হযরত হামযা (রাযি.)-এর ইয়াতীম কন্যা উমামা নিজের নানা বাড়ী মক্কাতেই ছিলো। শিশু উমামার নযর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর পড়তেই সে চাচা ! চাচা !! বলে দৌড়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে চলে এলো। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে যদিও শিশু উমামার চাচাতো ভাই হতেন, কিন্তু সে ইজ্জত ও সম্মানার্থে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে চাচা বলে ডাকলো। সেখানে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে হযরত আলী (রাযি.) উপস্থিত ছিলেন। তিনি উমামাকে আপন কোলে তুলে নিলেন। উমামাকে দেখে হযরত আলী (রাযি.)-এর ভাই হযরত জাফর এবং হযরত সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আযাদকৃত গোলাম হযরত যায়েদ (রাযি.) হযরত আলী (রাযি.)-এর কাছে এলেন। এবার তিন জনেই হযরত উমামা (রাযি.) কে নেয়ার জন্য ঠাণ্ডা ঝগড়া শুরু করে দিলেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক পাশে দাড়িয়ে এ দৃশ্য অবলোকন করছিলেন আর তাঁর দু'চোখ বেয়ে অশ্রুধারা প্রবাহিত হচ্ছিলো। কারণ তখন হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্মরণ হলো চাচা হযরত হামযা (রাযি.)-এর নির্মম শাহাদাতের কথা।

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের চাচাতো বোন উমামার প্রতি এ অনুকম্পা প্রদর্শনের জন্য তিন জনের উপরই খুশি হলেন। অতঃপর হযরত আলী (রাযি.)কে লক্ষ্য করে বললেন, হে আলী (রাযি.)! আমি তোমার থেকে আর তুমি আমার থেকে। হযরত যাইদ (রাযি.) কে লক্ষ্য করে বললেন, হে যাইদ ! তুমি আমার ভাই এবং আমার দোস্ত। হযরত জা'ফর (রাযি.)কে লক্ষ্য করে বললেন, হে জা'ফর তুমি আকৃতি এবং প্রকৃতির দিক থেকে আমার মতই। অতঃপর উমামাকে হযরত জা'ফর (রাযি.)-এর স্ত্রী হযরত আসমা (রাযি.)-এর হাতে সোপর্দ করে দিলেন। যিনি হযরত উমামার (রাযি.) খালা ছিলেন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, খালা মায়ের মতই হয়ে থাকেন। (ইবনে কাসীর ঃ ৪/২০৩)

হযরত আনাস (রাযি.) প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খাস খাদেম ছিলেন। শৈশবে তাঁর মা তাঁকে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাতে সোপর্দ করেছিলেন। হযরত আনাস (রাযি.) বর্ণনা করেন, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাজ করতে গিয়ে কখনো আমাকে গোস্বার স্বীকার হতে হয়নি। শুধু একবার হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে কোন কাজে পাঠিয়েছিলেন। আমি শিশুসুলভ অভ্যাস হেতু কাজের কথা ভুলে ছোট ছোট ছেলেদের সাথে খেলাধুলায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিলাম। আমার দেরী দেখে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে খুঁজতে বেরোলেন এবং আমাকে খেলায় রত অবস্থায় দেখে ধরে বললেন, 'তোমাকে কাজে পাঠিয়েছি আর তুমি খেলায় লিপ্ত হয়ে পড়েছো ? মনে চায় হাতের মেসওয়াক দিয়ে তোমাকে খুব মারতে।" এটিই ছিলো প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চুড়ান্ত পর্যায়ের গোস্বার বহিঃপ্রকাশ।

হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, এছাড়া আর কোন দিন হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে কিছুই বলেননি। এমনকি একথাও বলেননি যে, এটি করলে কেন ? কিংবা এমনটি করলে না কেন ?

একবার ঈদের মাঠে যাওয়ার পথে একটি ইয়াতীম শিশুকে পথে বসে কাঁদতে দেখে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে আদর করে তার দুঃখের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। সব শুনে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে নিজের বাড়ী নিয়ে গেলেন এবং গোসল করিয়ে সুন্দর জামা কাপড় পরিয়ে তাকে ঈদগাহে নিয়ে গেলেন। ক্রন্দনরত শিশুটির মুখে এবার আনন্দের হাসি ফুটে উঠলো।

এভাবেই তিনি সদা-সর্বদা ইয়াতীম অসহায়দের প্রতি স্নেহ-মমতা ও দয়া-অনুকম্পা প্রদর্শন করেছেন। পিতৃস্নেহে সিক্ত করে তাদের ব্যাথা বেদনা ভুলিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন।

অসুস্থের সেবা

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসুস্থের খোঁজ-খবর নেয়া এবং তাদের সেবা করার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি নিজেও এ বিষয়টিকে অত্যন্ত সচেতনতার সাথে লক্ষ্য রেখেছেন। অসুস্থ ব্যক্তির সেবা করাকে তিনি এক মুসলমানের প্রতি অপর মুসলমানের হক ও অধিকার বলে বর্ণনা করেছেন। শুধু মুসলমানই নয় বরং জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের সেবা করার ব্যাপারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত উদার ছিলেন। এমনকি অনেক সময় হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসুস্থ মুনাফিকের সেবা করার জন্যও স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে যেতেন এবং সেবা করতেন।

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন তোমরা কোন অসুস্থ ব্যক্তির খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য তার কাছে যাবে, তখন তার হাত এবং কপালে নিজের হাত রাখবে এবং তাকে শান্তনা দিবে। তার সুস্থতার জন্য মহান আল্লাহর দরবারে দু'আ করবে। (সীরাতুন্নবী (সা.) ২১৬)

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একজন খাদেম ছিলো ইয়াহুদী। সে অসুস্থ হয়ে পড়লে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

তার খোঁজ-খবর নিতে সে ইয়াহুদী খাদেমের বাড়ী গেলেন। দীর্ঘ সময় তার মাথার কাছে বসে তাকে শান্তনা দিলেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ আশ্চর্য ব্যবহারে খাদেমটি দারুন ভাবে প্রভাবিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নিলো।

মদীনার খযরজ গোত্র প্রধান হযরত সা'দ ইবনে উবাদা (রাযি.) একবার অসুস্থ হয়ে পড়লে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে দেখার জন্য তাঁর বাড়ীতে গেলেন। হযরত সা'দ (রাযি.)-এর অবস্থা এতই শোচনীয় ছিলো যে, রহমতের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে দেখে কেঁদে উঠলেন। তাঁর মোবারক চক্ষুদয় অশ্রুশিক্ত হয়ে উঠলো। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর আরোগ্যের জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ করলেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা হযরত সা'দ (রাযি.)কে সুস্থতা দান করেন।

সাহাবী হযরত জাবির (রাযি.) একবার অসুস্থ হয়ে দীর্ঘ দিন বিছানায় পড়ে থাকেন। এ সময়ে বেশ কয়েক বার নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বাড়ী যান। তার খোঁজ খবর নেন। হযরত জাবির (রাযি.)-এর বাড়ী বেশ দূরে থাকার পরেও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিবারই পায়ে হেঁটে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে তাঁর অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেন।

একদিন হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গিয়ে দেখতে পেলেন, রোগের তীব্রতায় হযরত জাবির (রাযি.) বেহুশ হয়ে পড়ে আছেন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন নিজ হাতে তার চেহারায় পানি ছিটিয়ে দেন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বরকতপূর্ণ পানির ছিটায় হযরত জাবিরের (রাযি.) জ্ঞান ফিরে আসে। এরপর আস্তে আস্তে তিনি সুস্থ হয়ে উঠেন।

এমনি আরো অসংখ্য ঘটনা রয়েছে যা থেকে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের সেবা শুশ্রুসার প্রমাণ পাওয়া যায়। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অপরের দুঃখে দুঃখিত হতেন। তা বিদূরিত করার সম্ভব্য সব রকম চেষ্টা ও ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। আর এজন্যই তো তিনি "রাহমাতুললিল আলামীন"।

জীব-জন্তুর প্রতি সদাচার

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু মানুষের প্রতিই সদাচরণ প্রদর্শন করেছেন- তা নয়, বরং তিনি আল্লাহপাকের সৃষ্ট অন্যান্য প্রাণী ও জীব জন্তুর প্রতিও অত্যন্ত ন্যায়সংগত ও সদাচরণ প্রদর্শন করতেন। কারণ তিনি শুধু মানুষের নবী ছিলেন না বরং তিনি মানুষ ও জীব-জন্তু নির্বিশেষে সকলেরই নবী ছিলেন।

একবার এক সফরে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দু'জন সাথী একটি চড়ুই পাখির বাসা থেকে দু'টি বাচ্চা ধরে নিয়ে এলে মা চড়ুইটি তার বাচ্চার সাথে সাথে করুণ সুরে ডেকে ডেকে মুক্তির আবেদন জানাতে লাগলো এবং আছাড়-পাছাড় খেয়ে সাথে সাথে চলতে লাগলো। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ অবস্থা দেখে বললেন, এ চড়ুইর বাচ্চা ধরে এনে কে এ চড়ুইটিকে এমন অস্থির করে তুলেছে ? বাচ্চা দু'টিকে ছেড়ে দাও" সাথীদ্বয় তৎক্ষণাৎ বাচ্চা দু'টি ছেড়ে দিলো (সীরাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৬/২৪১)।

অন্য এক সময়ের কথা। সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.) অনেক পিপড়া দেখে তা দূর করার জন্য পিপড়ার স্তুপের মাঝে আগুনের চুলা জালিয়ে দিলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা দেখে তৎক্ষনাৎ চুলা নিভিয়ে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। জীব-জন্তুর ব্যাপারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতকে বিস্তারিত নির্দেশনা দিয়েছেন। যেখানে জীব-জন্তুর প্রতি দয়া, অনুগ্রহ তাদের দানা-পানির ব্যবস্থা এবং ও গুলোকে সাধ্যের অতিরিক্ত কষ্ট না দেয়ার হুকুম করেছেন।

ইমাম বুখারী (রহ.) জীব-জানোয়ারের প্রতি দয়া সংক্রান্ত একটি ভিন্ন অধ্যায় কায়েম করেছেন। সেখানে তিনি একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটি নিম্নরূপ।

এক ব্যক্তি একটি কুকুরকে পিপাসায় কাতর দেখতে পেলো। সে দেখলো, কুকুরটি পানির পিপাসা নিবারণ করার জন্য জিহ্বা বের করে কাঁদা মাটি চাটছে। লোকটির দয়া হলো, সে কুয়া হতে পানি তুললো এবং কুকুরটি কে তা পান করালো। এতটুকু দয়া দেখানোর কারণে মহান আল্লাহ তার প্রতি অনুগ্রহ করলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন। সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.) এ ঘটনা শুনে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম-এর খিদমতে জানতে চাইলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! জানোয়ারের উপর দয়া করলেও কি সে কারণে পরকালে সওয়াব পাওয়া যায় ? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন, প্রত্যেক প্রাণীর প্রতি সদাচরণ করলেই তার একটা সওয়াব ও প্রতিদান রয়েছে।

একবার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক বাগানে নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য গেলেন। এ বাগানটি ছিলো একজন আনসারীর সে বাগানে একটি উট বাঁধা ছিলো। সে উটটি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে দেখে আহাজারী করতে লাগলো। তার দু'চোখ গড়িয়ে পানি পড়তে শুরু করলো। এক পর্যায়ে উটটি চিৎকার করে কাঁদতে লাগলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রাণীকূলের ভাষা বুঝতেন। তিনি উটটির কাছে এলেন এবং তার গর্দানে হাত বুলালেন, উটটি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদর পেয়ে কান্না থামালো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, এ উটের মালিক কে ? একথা শুনে উটের মালিক কাছে এলো। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, এসব জীব-জন্তুর ব্যাপারে তুমি কি মহান আল্লাহকে ভয় কর না, যে জন্তুর মালিক আল্লাহ পাক তোমাকে বানিয়েছেন ? উটটি আমার কাছে অভিযোগ করেছে, তুমি নাকি তাকে কষ্টের মধ্যে রাখ এবং তার প্রয়োজন পুরা করো না। অতঃপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে উটটির ব্যাপারে উপদেশ দিলেন এবং তাকে কষ্ট না দেয়ার নির্দেশ দিলেন। (আখলাকে রাসূলে আকরাম (সা.) পৃ. ৬৩)

শেষ কথা

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পূর্ণ জীবনটিই উত্তম ও উন্নত গুণাবলীর বাস্তব নমুনা। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুওওত পরবর্তী জীবন যেমন আমাদের জন্য আদর্শ, তেমনি নবুওওতপূর্ব জীবনও আমাদের জন্য অনুকরণীয়। এক কথায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সকল গুণের আধার। উপরে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সে উন্নত ও সার্বজনীন

গুণাবলী হতে মাত্র কয়েকটি দিক নিয়ে আলোচনা করা হলো। এভাবে আলোচনা করলে দীর্ঘ ভলিউমের গ্রন্থ তৈরী হতে থাকবে তবুও হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর গুণাবলীর আলোচনা শেষ হবে না। কারণ, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মহান আল্লাহ তা'আলা নিজ কুদরতী হাতে সকল উত্তম ও উন্নত গুণাবলীর মূর্ত প্রতীক হিসেবে তৈরী করে বিশ্ববাসীর জন্য এক মহত্তম আদর্শ হিসেবে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, (হে বিশ্ব মানব মণ্ডলী!) তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মধ্যে রয়েছে অতি উত্তম আদর্শ। (সূরা আহযাব ঃ ২১)

মহান আল্লাহ আমাদেরকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উন্নত চরিত্র বৈশিষ্ট ও উত্তম আদর্শ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে উজ্জ্বল, উন্নত ও ইহ-পরকালীন সফল জীবন গড়ে তোলার তাওফীক দান করুন, আমীন।

শেষ

সহায়ক গ্রন্থাবলী

পবিত্র কুরআন শরীফ
বুখারী শরীফ
মুসলিম শরীফ
তিরমিযী শরীফ
মিশকাত শরীফ
ফাতহুল বারী
ইবনে কাসীর
খাসায়েসে কুবরা
তাবাকাতে ইবনে সা'দ
সীরাতুন্নবী (সা.)
আখলাকে রাসূলে আকরাম (সা.)
জযবুল কুলূব
সীরাতে ইবনে হিশাম
সীরাতে মুস্তফা (সা.)
সীরাতে রাসূলে আকরাম (সা.)
শাশ্বত নবী (সা.)
আখলাকে নববী ওয়াকেয়াতকে আয়না মেঁ
নতুন চাঁদ (ই, ফা, বা)
ভোলা যায় না যেসব কাহিনী
মাসিক অগ্রপথিক (সীরাত সংখ্যা '৯৭)
মাসীক মদীনা (সীরাত সংখ্যা '৯৪)
মাসিক রাহমানী পয়গাম (সেপ্টেম্বর '৯৭)
অনুপম আদর্শ (অগ্রপথিক সংকলন)
মাসিক খতমে নবুওয়ত (উর্দূ)
রৌশন সেতারে

মাকতাবাতুল আবরার কর্তৃক প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থ